Vol. 32 | No. 1 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবুল ফজলের ছোটগল্প

Volume	32
Issue	1
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন
Published online	October 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v32i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i1.7
Pages	169-219
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আবুল ফজলের ছোটগল্প

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধকার হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও বাংলা কথাসাহিত্য তথা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। প্রথম জীবনে তিনি কথা-সাহিত্যিক হিসেবেই সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, যদিও শেষ জীবনে তিনি বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রবন্ধরচনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁর কথা-সাহিত্য থেকে প্রবন্ধসাহিত্যে উত্তরণকে সমালোচক এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "উপন্যাসে আবুল ফজল সমাজভাবনাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। ছোটগল্পে প্রাধান্য দিয়েছেন যৌনসমস্যার। যৌনতার পাশাপাশি সামাজিক পরিপ্রেক্ষি-তকে আবুল ফজল বাদ দেননি। ক্রমশ কথা সাহিত্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে কথাসাহিত্যের সমাজভাবনাকে পরবর্তীকালে কাহিনী ও চরিত্রের কথামালায় না সাজিয়ে, প্রবন্ধের যুক্তিশীলতার প্রতি লেখকের আস্থা দৃঢ় হয়ে ওঠে।"[১] চৌচির (১৯৩৪), সাহসিকা (১৯৪৬), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০-৪১), জীবনপথের যাত্রী (১৯৪৮), রাঙা প্রভাত (১৯৫৭) ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি ছোটগল্প রচনাতেও নিজেকে একজন উঁচুস্তরের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে আবুল ফজল কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচারধর্মী ও আদর্শবাদী হওয়ার কারণে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির শিল্পগুণ ব্যাহত হয়েছে। "তাঁর সমাজচেতনা ও শিল্পচেতনা দুটোই প্রখর। আদর্শবাদ তাঁর শিল্পকর্মকে কোথাও কোথাও করেছে, প্রচার-প্রবণতা স্থানে স্থানে উচ্চ-কণ্ঠ হয়ে সমাজসংস্কারের মোহ উপন্যাসের গতিকে যে মন্থর করেনি, এমনও নয়, তবু তাঁর সহজাত শিল্পচেতনা এবং মানবতাবোধ উপন্যাসের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠেছে। তাঁর আদর্শবাদ ও প্রচার প্রবণতা তাঁর বিশেষ সমাজচেতনার ফল"।[২] আবুল ফজলের উপন্যাস সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্য যতোটা প্রযোজ্য, ঠিক সমানভাবেই তা সত্য ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম থেকে এ-সত্যই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সারাজীবন নিছক শিল্পের জন্যে

শিল্পচর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তিনি জীবন ও সমাজের জন্যেই শিল্প-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গেছেন। এ-প্রসঙ্গে স্বনির্বাচিত গল্প সংকলনে লেখক নিজেই বলেছেন: "আমার অন্যান্য লেখার মতো এ লেখাগুলিতেও আমাদের সামাজিক বিবর্তনের কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে বরং কোন কোন গল্পে তা গল্পের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। শুধু গল্পের খাতিরে গল্প আমি খুব বেশী লিখিনি। সাহিত্যের যে এক বিশেষ সামাজিক ভূমিকা আছে গোড়া থেকেই এ ধারণা আমার বদ্ধমূল। ব্যক্তি ও সমাজকে ব্যবহারিক জীবনে, দৈনন্দিন অভ্যস্থ মন ও চোখ দিয়ে যেটুকু দেখা, বা জানা তা নেহাৎ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। সাহিত্য আর শিল্পের আলোয় জানাই হচ্ছে যথার্থ জানা।"৩

দুই

আবুল ফজলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মাটির পৃথিবী' (১৯৪০) [প্রথম সংস্করণ (১৩৪৭ বাংলা) আলবার্ট লাইব্রেরী, নবাবপুর ঢাকা]। দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'আয়ষা' (১৯৫১) [প্রথম সংস্করণ (১৩৫৮ বাংলা), তাজ লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম]। তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৬৪), [প্রথম সংস্করণ (১৩৭১ বাংলা), নিউজফ্রন্ট, চট্টগ্রাম। চতুর্থ 'গল্পসংকলন' (১৯৭৮) [প্রথম সংস্করণ (১৩৮৫ বাংলা), মুক্তধারা, ঢাকা]।

"মাটির পৃথিবী" গল্প গ্রন্থে মোট সতেরটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পসমূহ হলো: 'আয়ষা', 'একখানি হাসি', 'হাকিম', 'পরদেশিয়া', 'জয়', 'জনক', 'সংস্কারক', 'লাঠ্যৌষধ', 'আলোছায়া', 'শরীফ', 'আহমদ', 'নবাব-আমীর-বাদশাহ', 'চোর', 'পরিণাম', 'দুইরাত্রী', 'রহস্যময়ী প্রকৃতি ও মাটিরপৃথিবী'। "আবুল ফজলের প্রথম প্রকাশিত দুইটি গল্পের একটি অনুবাদ। অনূদিত গল্প 'কুফানগরে' মূলানুগ নয়, ভাবানুবাদ। মূল লেখক আরবী ভাষায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবু মোহাম্মদ আল্ কাসেম ইবনে আলী আল হারিরী (১০৩০-১১০০)। গল্পটির প্রথম প্রকাশ ঘটে 'কল্লোল' (কার্তিক ১৩৩৪) পত্রিকায় 'আরবী গল্প' শিরোনামে। পরবর্তীকালে 'কুফানগরে' নামে 'সপ্তপর্ণা'য় গল্পটি সংকলিত হয়। প্রথম মৌলিক গল্প 'ইসলাম কী জয়', এর প্রকাশ ঘটে একই সময়ে 'সওগাত' (কার্তিক ১৩৩৪)

পত্রিকায়। গল্পটি পরবর্তীকালে 'জয়' নামে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মাটির পৃথিবী'তে সংকলিত হয়েছে।[৪]

'আয়ষা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, বৈশাখ, ১৩৩৬ সংখ্যায়। সওগাতে প্রথম প্রকাশের সময় এর নাম ছিল 'অনুক্ত কাহিনী'। 'মাটির পৃথিবী' ও 'আয়ষা' গল্পগ্রন্থে 'আয়ষা' নামে গল্পটি ছাপা হয়। পরে শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলনে এর নাম করা হয় 'মা। এ প্রসঙ্গে গল্পকার নিজেই বলেছেন, "'মা' গল্পটির আদি নাম ছিল 'অনুক্ত কাহিনী' পরে প্রধান চরিত্রের নামানুসারে নাম হয় 'আয়ষা'। এখন মূলভাবের সঙ্গে মিল রেখে নাম হয়েছে 'মা'। গল্পের কাহিনীটিকে সরল দুটি অংশে বিভক্ত করে নেয়া যায়। হামিদুল্লাহ্ শিকদার অবস্থাসম্পন্ন কৃষক। পাশের বাড়ির খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে তার বিবাদ। ওয়ারিশসূত্রে সে ও তাদের সমান সম্পত্তিরই মালিক হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে বড়ত্বের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো কে কোথায় কত বড় ঘরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে, সম্বন্ধ স্থাপনে কে কত মোহর ব্যয় করতে পারলো ইত্যাদি নিয়ে। কোরবানীর সময়ে একপক্ষ আরেক পক্ষকে অধিক দামে গরু ক্রয় করে হারিয়ে দিত। এরই মধ্যে একপক্ষের গরু অন্য-পক্ষের ফসল ক্ষেতে প্রবেশ করলে একদিন তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যায় এবং প্রতিপক্ষ হামিদকে ছোটলোকের কন্যা বিয়ে করেছে বলে গালি দেয়। এতে হামিদের আত্মসম্মানে দারুণভাবে লাগে। কারণ একদিন সে পিতামাতার ইচ্ছাকে অবহেলা করে জামালপুর চৌধুরী বাড়িতে বিয়ে না করে ভালবাসার কারণে আয়ষাকে বিয়ে করেছিল। অবশ্য বিয়ের পর আয়ষা সবকিছু বুঝতে পেরে স্বামীকে উপযুক্ত ঘরে আরেকটি বিয়ে করার অনুমতি দেন। কিন্তু সতীনের উপর কেহ মেয়ে বিয়ে দিতে রাজী না হওয়ায় হামিদ একদিন ছেলে দু'টিকে নিজের কাছে রেখে মেয়েটিসহ আয়ষাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আয়ষার এ স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পর দশ হাজার টাকা কাবিন লিখে এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকার অলংকার দিয়ে হামিদ সোনাখালী কাজী বাড়ি থেকে জমিলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। জমিলাকে ঘরে আনার পর হামিদ বুঝতে পারলো জমিলার অভিভাবকরা বিয়ের আগে অন্য কোন সুন্দরী মেয়ে দেখিয়ে জমিলাকে হামিদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিয়ের কাবিন রেজিস্ট্রী হয়ে যাওয়ায় হামিদদের পক্ষে করণীয় কিছুই ছিল না।

অগত্যা সে বিয়ের জন্যে যে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করেছে তার সুদ বাবদ মাসিক দুইশত টাকা করে মহাজনের নিকট জমা দিতে লাগলো। এদিকে দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা একদিন বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে আসবেনা বলে খবর পাঠালো। তার অভিযোগ হলো, হামিদ পূর্বের স্ত্রীকে আদৌ তালাক দেয়নি এবং সম্প্রতি আগের স্ত্রীর ঘরে তার একটি বাচ্চা হয়েছে। হামিদ এ খবরে আঘাত পেয়ে সুন্দরী মেয়ে দেখিয়ে কালো মেয়ে বিয়ে দেবার অভিযোগে শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলো এবং শ্বশুরও পাল্টা জোচ্চুরির মামলা ঠুকে দিল। এতে হামিদের বড় দুইটি তালুক বিক্রী করতে হলো। এরই মধ্যে হামিদ শ্বশুর পক্ষের সাথে আরেকটি ঝগড়ায় জড়িত হয়ে সম্পর্ক একেবারে তিক্ত করে তুললো। এমতাবস্থায় সে প্রথমা স্ত্রী আয়ষাকে বাড়ি নিয়ে এলো। এইবার চাচাতো ভাইয়েরা তালাকপ্রাপ্তা নারী নিয়ে ঘর করার গুজব রটিয়ে দিয়ে হামিদকে এক ঘরে করার প্রচেষ্টা চালালো। এতে দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা চাচাতো ভাইদের সাথে যোগ দিয়ে হামিদকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। হামিদ মৌলবীকে ৫০ টাকা ঘুষ দিয়ে স্বপক্ষে একটি ফাতওয়া লিখিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু তার দ্বিতীয় শ্বশুর সেই মৌলবীকে একশত টাকা দিয়ে হামিদের বিরুদ্ধে আরেকটি ফাতওয়া লিখিয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত হামিদ গ্রাম্য রাজনীতিতে পরাজয় বরণ করে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে অসহায় ভাবে পৃথিবী হতে চির বিদায় গ্রহণ করে। গল্পটির সমাপ্তি এখানেও হতে পারতো। কিন্তু লেখক কাহিনীটিকে সম্প্রসারিত করে হামিদের পুত্র-কন্যাদের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যান। হামিদের পুত্রেরা এক সময়ে পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয়। শুরু হলো ২ গ্রামের মধ্যে শত্রুতা। পরস্পরের প্রতি চোর লেলিয়ে দিয়ে কিংবা বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে উভয় গ্রামের রেষারেষি চরমে উঠলো। শেষ পর্যন্ত একটা স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে গ্রামের গণ্যমান্যদের হস্তক্ষেপের ফলে হামিদ শিকদারের বড় মেয়ে সখিনার সাথে গ্রামের কাজী সাহেবের নাতি ইব্রাহিমের বিয়ে দেয়া হলো। এ বিয়েতে হামিদ শিকদারের পুত্রেরা প্রথমে রাজি ছিল না। পরে গ্রামবাসীর সম্মিলিত চেষ্টায় বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। ইব্রাহিম রেঙ্গুনে কারবার করে। প্রতিবছর ২ বার মাত্র দেশে আসে। বিয়ের ২ বছর পর একবার কাউকে না জানিয়ে ইব্রাহিম শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে

আসে। এ বছর তার ৫ হাজার টাকা লাভ হয়েছে এবং ২/৩ হাজার টাকা সঙ্গে করে বাড়িতে এসেছে। এ খবর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার শ্যালক মতিন ও শামসু জানতে পারে এবং ভগ্নিপতির কাছ থেকে টাকাটা হরণ করে নেয়ার ফন্দি করে। এ ঘটনা সখিনা অনুধাবন করতে পারে এবং সে কৌশল স্বামীকে টাকাসহ রাত্রিবেলা কোন কিছু বুঝতে না দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। ইব্রাহিম যাবার সময়ে সখিনাকেও নিজ বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সখিনা পরদিন ভাইয়ের সাথে আসবে বলে টাকাগুলো ইব্রাহীমের সঙ্গে দিয়ে দেয়। এমনকি, ইব্রাহীমকে সে বলে দিয়েছিল যাতে সে যাবার সময়ে কাউকে না জানিয়ে চলে যায়। রাতের আঁধারে ইব্রাহীম চলে যাবার পর সখিনা মায়ের ঘরে গিয়ে বালিসের নীচে চাবি রাখার নাম করে একটি চিঠি রেখে যায়। এক সময়ে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে সখিনা স্বামীর জন্য রচিত শয্যায় ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে মতিন ও শামসু উভয়ে এসে ইব্রাহীম মনে করে সখিনাকে হত্যা করে। নিজ বোনকে হত্যা করেছে একথা বুঝতে পেরে দুই ভাই একেবারে বুদ্ধিহারা হয়ে বসে থাকে। ভোরে আয়ষাকে দেখেই দুই দুইভাই মিলে সখিনা তার স্বামী কর্তৃক নিহত হয়েছে বলে চীৎকার করতে থাকে। এদিকে পুলিশের কাছেও তারা সাক্ষ্য দিল যে, রাত্রে ইব্রাহীম সখিনার সাথে একই ঘরে ঘুমিয়েছিলো এবং ঝড় দুর্যোগের রাতে সুযোগ বুঝে সে তাদের বোন সখিনাকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে। স্ত্রী-হত্যার অপরাধে ইব্রাহীমকে গ্রেফতার করা হলো। প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীর অভাবে তাকে ফাঁসির পরিবর্তে দ্বীপান্তর দেয়া হলো। বিচারপতির রায়-পাঠ শেষ হবার সাথে সাথেই আয়ষা গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায়ে দাঁড়িয়ে বিচারপতির কাছে একটি পত্র হস্তান্তর করলো। এ-পত্রে সখিনা তার দুই সহোদর ভাই-কর্তৃক তার স্বামীর ইব্রাহীমকে হত্যা করার পরিকল্পনা এবং টাকা-পয়সা দিয়ে পৈত্রিক অপমানের শোধ গ্রহণ করার বিস্তারিত ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। আয়ষা আরো বলে গেলো যে, সে এতোদিন অপত্যস্নেহে সত্য প্রকাশে দ্বিধান্বিত ছিলো। কিন্তু সে আজ তার প্রায়শ্চিত্য করার জন্যে এখানে হাজির হয়েছে। হাকিম পুনরায় রায় লিখলেন, হত্যাকারী মতীনউদ্দিনের ফাঁসি এবং দ্বিতীয় সাক্ষী শামসুদ্দীনের দ্বীপান্তর হলো।

'মা' গল্পটির কাহিনীপরিকল্পনায় উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল। একটি বৃহত্তর পরিসরে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের সমস্যাকে গল্পকার অংকন করেছেন। ব্যক্তিগত হীনমন্যতাজনিত প্রতিযোগিতা কি করে শেষ পর্যন্ত ২টি গ্রামের মধ্যে বংশপরম্পরায় চলতে থাকে তারই কাহিনী এ গল্পে স্থান পেয়েছে। হামিদুল্লা শিকদারের মৃত্যু পর্যন্ত গল্পটিকে শেষ করে দিলে গল্পটিকে ২টি গল্পে বিভক্ত করা যেতো। গল্পটি সহজ সরল গতিতে কাহিনীর উপর নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। মতিন এবং শামসু তাদের ভগ্নিপতিকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করার পূর্বেই সখিনাকে হত্যা করার ব্যাপারটি পাঠক মনে অস্বাভাবিক ঠেকে। যাহোক, এখানে মা চরিত্রটিকে মাহাত্ম্য দান করাই সম্ভবতঃ গল্পকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং গল্পের শেষ পর্যায়ে তিনি তা সম্পাদন করেছেন। আয়ষা চরিত্রটি গল্পের সবচেয়ে সংঘাতময় চরিত্র এবং তা গল্পের মূল স্রোতধারা হিসেবে পাঠক মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে।

'মাটির পৃথিবী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত (১৯৪৩) পত্রিকায়। কারখানার শ্রমিক তজু একজন খেটে খাওয়া মানুষ। স্বাভাবিক অভাব অনটনের সূত্র ধরে তার মা ও স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া লেগে থাকে আবার পরক্ষণেই শ্বাশুড়ী-বউ ঝগড়া ভুলে গিয়ে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলে। তজুর স্ত্রী খাতুন। বৌয়র মুখ কোনদিনই তজুর পছন্দ নয়। মুখের বাম পাশে ছোটকাল থেকেই একটি পোড়া দাগ কালো হয়ে আছে। তাই চার পাঁচটি ছেলে-মেয়ের মা হওয়ার পরও তজু তাকে 'পোড়ামুখী' বলে ডাকে। তজুদের সামনের ঘরে বাস করে ছলিমন, ছলিমনের মা, ছলিমনের ভাই আর তার অকর্মন্য স্বামী। ছলিমনের ভাইটি চায়ের দোকানে কাজ করে। ছলিমনের স্বামী বদমেজাজী, গেঁজেল এবং নিষ্কর্মা। সে কোথাও চাকরী পেয়ে টিকতে পারে না। সারাদিন শহরময় টো টো করে ঘুরে বেড়ায় আর রাতে এসে বিড়ি টানতে টানতে শুয়ে পড়ে। তজু এবং ছলিমনের পরিবারের মধ্যে ঝগড়া একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একবার তজুর বড় মেয়ে সাবেরা তার নাকের বেশর হারিয়ে ফেলে। কে চুরি করেছে তা বের করার জন্যে উত্তর পাড়া থেকে 'চালান' দেবার জন্যে এক বুড়ীকে ডেকে আনা হয়। বুড়ী লোটা চালান দিয়ে ছলিমনকে চোর হিসেবে সন্দেহ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো দুই পরিবারের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড। অথচ, ছলিমনের মায়ের পরামর্শেই চালান-দেয়া বুড়ীকে আনা হয়েছিলো। একদিন তজুর বউয়ের ছাগল ছলিমনের এলাকায় প্রবেশ করলে পুনরায় ঝগড়া শুরু হয়। এমনি ভাবে ছোটখাট ঝগড়া এবং আবার ভাল হয়ে যাবার মাঝ দিয়েই এ-দুটি গ্রামীণ পরিবারের বসবাস। এরই মধ্যে দ্বিতীয় সন্তানের প্রসবকালে ছলিমন মৃত্যুবরণ করে। ছলিমনের অকর্মণ্য স্বামী সন্তানের কোন তোয়াক্কাই রাখলোনা। অথচ ছলিমনের মা দারুন কষ্টের ভিতর দিয়ে বাচ্চাটিকে লালন পালন করতে লাগলো। একসময়ে দেখা গেলো রাতের অন্ধকারে বারান্দায় রক্ষিত ছলিমনের নিঃস্ব বাচ্চাটিকে তজুর বউ খাতুন চুপি চুপি এসে বুকের দুধ খাওয়ায়ে যেতে থাকলো। ঘটনা একরাতে ছলিমনের মা নিজের চোখেই দেখলো। অথচ, নিজের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে কিছুই করতে পরলো না। শেষ পর্যন্ত তজুর বউয়ের মানবিক সত্তার বিকাশ ঘটানোর মাঝ দিয়ে গল্পটির সমাপ্তি টানা হয়। গল্পটির কাহিনীতে কোন জটিলতা নেই। অভাব অনটন এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহের সহজ সরল চিত্র অংকনের মাধ্যমে গল্পে বাস্তবতা আনয়ন করা হয়েছে। গল্পটি অতিকথন দোষ-মুক্ত নয়। কাহিনীটি আরও অল্প কথায় শিল্পায়িত করে বর্ণনা করা যেতে পারতো। সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ফলে চরিত্রে বাস্তবতা এসেছে। "গল্পকার আবুল ফজলের স্বকীয়তা সমস্ত দোষগুণসহ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে যে সকল গল্পে প্রকাশ লাভ করেছে 'মাটির পৃথিবী' গল্পটি তাদের মধ্যে অন্যতম। এই গল্পে এবং আবুল ফজলের প্রায় সকল গল্পেই, চরিত্র অপেক্ষা চিত্রাঙ্কনই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেই চিত্রাঙ্কন এখানে সার্থক এবং রসোত্তীর্ণ। সমাজের নীচতলার মানুষকে সহানু-ভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে দেখবার প্রবণতা এই গল্পে বিদ্যমান। স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকলেও 'মাটির পৃথিবী' যে বস্তীর মানুষের কাহিনী তা বলাই বাহুল্য। গল্পের নায়ক তজু কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করে, ছলিমনের স্বামী বেকার, বাড়িতে মেয়েরা সামান্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে প্রবল ঝগড়াঝাঁটি করে একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে তোলে। গল্পের পরিবেশ এমনি যেখানে অনায়াসেই নতুনত্বের চমক সৃষ্টি করা যায়। 'মাটির পৃথিবী'র মধ্যে পাশাপাশি যে দুটি পরিবার কেবলি ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে দিন কাটাত তারা শেষ পর্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। যে ছলিমনের কথা খাতুন সহ্য করতেই পারতনা,

সেই ছলিমনের মৃত্যুর পর তার শিশু সন্তানের চীৎকারে খাতুন সাড়া না দিয়ে পারেনি। ছলিমনের চীৎকারের জবাব খাতুন দিয়েছে চীৎকারের দ্বারা। কিন্তু ছলিমনের শিশুসন্তানের চীৎকারের জবাবে খাতুন এগিয়ে দিয়েছে তার বুকের স্তন্য। এইখানে জীবনের দায়িত্বকে ছাপিয়ে মানবতার জয় সূচিত হয়েছে গল্পের মধ্যে। ঘৃণা ও দলাদলির উপর জয় সূচিত হয়েছে প্রেমের। দারিদ্র্য অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত মানুষের মধ্যেও মানবতার বিকাশ-সম্ভাবনাকে লেখক কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেননি। তবে একটি কথা ঠিক যে, এই গল্পের কাহিনীতে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার ছায়াপাত ঘটে নি। কারখানার দরিদ্র মিস্ত্রির জীবন-কাহিনী তার পারিবারিক বৃত্তের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, তার কর্মক্ষেত্র কারখানায় যেখানে যুগ-সংঘাত স্পষ্টরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে সেখানে তা প্রসারিত হয়নি। কাহনী মনে হয় যেন সমাজ সমুদ্রের সেই তলদেশের যেখানে উপরিভাগের আলোড়ন বিক্ষোভ পোঁছায়না। শিল্পী এখানে সমাজ সচেতন তত নন যতোখানি হয়ে উঠেছেন মানবতাবাদী।”[৬]

‘একখানি হাসি’ প্রথম প্রকাশিত হয় মোহাম্মদী, ফাল্গুন ১৩৩৯ সংখ্যায়। গল্পের নায়ক রফিক। সে সদ্য নতুন এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার হিসেবে যোগ দিয়েছে। চ্যাম্বারস এবং ন্যাসফিল্ডের অর্থ আর গ্রামারেও তার বেশ দখল এবং জীবনে মানুষরূপী গরু-গাধাকে মানুষ করার এ্যাম্বিশন নিয়ে সে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছে। স্কুলের পুরনো শিক্ষক সৈয়দ চেয়েছিল এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার হতে, কিন্তু রফিকের যোগ দেয়ার ফলে তা আর হয়ে ওঠেনি বলে সৈয়দ ভেতরে ভেতরে রফিকের ওপর রুষ্ট ছিল। সৈয়দ বি. এ. পাস করার পর পর্যায়ক্রমে আই. সি. এস., আই. পি. এস., বি. সি. এস. এমনকি সাবরেজিস্ট্রার পর্যন্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু কোথাও কিছু না হবার পর সে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে অফিসে একটি দরখাস্ত জমা দিয়ে প্রতিদিন নিয়োগ পত্রের প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। গ্রাম বাংলার স্কুল বিধায় প্রায় সকল শিক্ষকর ক্লাসের ফাঁকে হুকো খেয়ে থাকে এবং সে অবসরে একে অপরেকে খোঁচা মারা বা টিপ্পনী কাটতেও পিছপা হয়না। একদিন ধীর মন্থর গতিতে ক্লাসে গিয়ে ঢুকতেই যেনো রফিকের মাথায় বিনামেঘে বজ্রপাত হলো। ক্লাসের পশ্চিম কোণে এক ছেলে বসে প্রতিদিন। সে যেনো আর

কোথাও বসতে পারে না। তার নাম মনির। রফিক প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করে এসেছে, মনির কারো চোখ পড়লেই নিম্নমুখী হয়ে মুচকী হাসে। মনিরের এ অকারণ হাসি রফিক মাস্টারের মনে ধারালো ছুরির মতো আঘাত হানতে থাকলো। ধীরে ধীরে মনিরের হাসি রফিক মাস্টারের জন্যে অসহ্য হয়ে উঠলো। রাতের অন্ধকারেও যেন সে হাসি সূচের মতো বিঁধতে লাগলো। এমন কি সে হাসি তার কাছে মনে হতো যেন তা তার ত্রিশ বছরের শিক্ষকতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। তাই একদিন ক্লাসের মধ্যে সামান্য একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্যে রফিক মাস্টার মুনীরকে এমন বেদম প্রহার করলো যে, প্রহারের চোটে মাস্টার নিজেই অজ্ঞান হয়ে পড়ার উপক্রম হলো। রফিকের ধারণা, এ পর্যন্ত কত গাধাকে সে ঘোড়া বানিয়ে ছেড়েছে আর এই ছোঁড়া কিনা হাসে, উপহাসে না করুণায়। অথচ রফিক এতদিন নিশ্চিন্ত আরামে বিদেশে শিক্ষকতা করে এসেছে। বাড়িতে থেকে স্কুল করে জীবনের বার্ধক্যটুকু সুখে কাটাবার প্রত্যাশায় দশ টাকা কম বেতন স্বীকার করে সে এ চাকুরীতে যোগ দিয়েছে। এখন সুখের দখিনা বাতাস হাড়ে হাড়ে রফিক টের পেতে থাকলো। কয়েক দিন গ্রামার আর পরীক্ষাসর্বস্ব রফিক মাস্টার একই ক্লাসে ইংরেজী পড়াতে গিয়ে আবারো দেখলো মনিরের সেই হাসি। এবারও সে আঘাত বুকের মধ্যে চেপে রেখে ক্লাসের বাইরে এলো। কিন্তু পরের ঘন্টায় সে ক্লাসে বাংলা পড়াতে গিয়ে আরেকটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবার সেই একই হাসি দেখে কথায় কথায় মনিরের দুই গালে ঠাস্ ঠাস্ করে কসে দুই চড় বসিয়ে দিলো।

সেদিনই রফিক হেড মাস্টারের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করলো। সৈয়দের প্রশ্নের উত্তরে রফিক বললো, এখানকার গাধাকে ঘোড়া বানাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র বরং তাতে তার নিজেরই গাধা হয়ে যাবার ষোল আনা সম্ভাবনা। বুড়ো বয়সে কোথায় চাকুরী খুঁজতে যাবে, নিকুঞ্জ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে রফিক জানালো সে পূর্বের চাকুরীতে ইস্তফা দেয়নি, চারমাসের ছুটি নিয়ে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত মনিরের হাসিকে কেন্দ্র করেই রফিক মাস্টারকে চাকুরী ছেড়ে যেতে হলো। গল্পটিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কাজে লাগানো হয়েছে। আমাদের জীবনে অতি সামান্য ঘটনাও যে কখনো কখনো তুচ্ছের উর্ধ্বে উঠে বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়

গল্পটিতে তা বিবৃত হয়েছে। গল্পটিকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক হাসির গল্প বলে অভিহিত করতে পারি।

আবুল ফজলের প্রতিভা ট্র্যাজেডী সৃষ্টির অনুকূল ছিলনা। তাঁর বেশীর ভাগ রচনাই কমেডী জাতীয়। তবুও 'একখানি হাসি' গল্পটি তিনি ট্রাজেডী হিসেবে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এখানকার ট্রাজেডী কেবলমাত্র রফিক মাস্টারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমাদের গ্রাম বাংলার বহু শিক্ষকের প্রতিচ্ছবি যেন খুঁজে পাওয়া যায় রফিক মাস্টারর আচরণের ভিতর। রফিক মাস্টার একজন গ্রামার-সর্বস্ব সীমিত জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষক। প্রথম জীবনে যা কিছু তিনি শিখেছেন তাকেই ভাঙিয়ে খাচ্ছেন সারাজীবন। রফিক মাস্টাররূপী শিক্ষকেরা যুগের সাথে তাল মেলাতে পারেন না। অথচ তারা মনে করেন সমাজ যেহেতু তাদেরকে উপযুক্ত সচ্ছলতা দিতে পারে না তাই তাদেরকে দিতে হবে শ্রদ্ধা। এটা তাদের এক ধরনের দারিদ্র্যজনিত অহংকার। গাধা পিটিয়ে মানুষ তৈরী করা তাদের গর্ব। এমনি ধরনের মানুষ তৈরীর এ্যাম্বিশন নিয়েই রফিক মাস্টার গ্রামের স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, দারিদ্র্যের অহংকার সমাজের রূঢ় বাস্তবতার সামনে শুধুমাত্র করুণা আর উপহাসেরই বিষয়। "সেই উপহাসের প্রতীক রূপে গল্পের মনিরের মুখে লেখক দিয়েছেন একটুকরো নির্মম হাসি। সেই হাসিকে প্রবীণ শিক্ষক আবিষ্কার করলেন যেন একেবারে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, তাতে তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। এখন ঐ হাসি তিনি উপেক্ষাও করতে পারনে না, সহ্যও করতে পারেন না। বিশেষ করে সেই সাদা ঠোঁটের নীরব হাসিটি সে কিছুতেই ভুলতে পারল না—জনসভার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নীরব হাসিটি উপেক্ষা ও করুণায় যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। বৃদ্ধ শিক্ষকের শেষ জীবনের সঙ্গী হল এ হাসি। ঐ হাসি উপহাসের, হয়ত বা করুণার; এবং মর্মান্তিকভাবে নিষ্ঠুর।"[৭] রফিক মাস্টার যে ধরনের বিশ্বাস আর মূল্যবোধ নিয়ে শিক্ষকতাকে সম্বল করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, সৈয়দ মাস্টার কিন্তু ততোটা সেকেলে নয়। সৈয়দ মাস্টার একজন নবীন শিক্ষক, বর্তমান যুগের মানুষ। তাই তিনি উপলব্ধি করতে শিখেছেন কঠিন বাস্তবতাকে। শিক্ষকতার ভাববাদী আদর্শ তার কাছে জীবনের একমাত্র অবলম্বন নয়। তাই সে শিক্ষকতার পেশায়

নিয়োজিত থাকলেও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে অফিসে চাকুরীর জন্যে দরখাস্ত করে রেখেছে। কারণ সে জানে, শিক্ষকতার তথাকথিত আদর্শ বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকখানি মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান যুগে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারলে সমাজের কাছে হাস্য-কৌতুক আর পরিহাসের পাত্র হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'হাকিম' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ছায়াবীথি, কার্তিক ১৩৪০ সংখ্যায়। আবদুল্লার অবস্থা একসময়ে মোটামুটি ভালই ছিল। আট-দশ বিঘা চাষের জমি ছিল এবং নিজে স্থানীয় জমিদার মজুমদারদের তহশীলদারী করে মাহিনা ও উপরি-পাওনায় দশ'-বিশ টাকা সরিয়ে নিত, তাতেই খাওয়া-দাওয়া ও ঘর-সংসারের যাবতীয় খরচ পুষিয়ে যেতো। আবদুল্লা ও তার স্ত্রী ফাতেমার স্বপ্ন ছিল তাদের আদরের পুত্র সিকান্দার আলমগীর বড় হয়ে একদিন হাকিম হবে। সে কারণে তারা ছোটবেলা থেকেই আলমগীরকে হাকিম বলে ডাকতো। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তারা অভাব-অনটনের তোয়াক্কা না করে ছেলেকে পড়াতে লাগলো। ছেলে একদিন ম্যাট্রিক পাস করলো। তারপর ছেলে কলেজে ভর্তি হলো এবং ভালভাবেই পাস করতে লাগলো। ছুটিতে আলমগীর বাড়ি এলে পাড়া-পড়শীরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ হাকিমের প্রতি তাকিয়ে থাকতো আর মনে মনে জ্বলতো। তাদের ধারণা ছিল আবদুল্লা জমিদারের টাকা লুট করতো আর সে লুটের টাকায় ছেলেকে হাকিম বানানোর প্রক্রিয়া চলছে। অথচ পীর সাহেবের ছেলের হেদায়েত অনুযায়ী আবদুল্লা ইদানীং উপরি নেয়া এবং ঘুষ নেয়া ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র বেতনের ওপর নির্ভর করে সংসার চালাচ্ছে। এ দিকে আলমগীর নিজেও ভবিষ্যতে হাকিম হবার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে সে হাকিমের মতো এজলাসে বসে বিচার করার ডেমোনস্ট্রেশন দিতে লাগলো। ছেলের পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে আবদুল্লা একেবারে হিমসিম খেয়ে গেলো। এতে করে প্রায় সকল জমিনই বন্ধক চলে গোলো। স্ত্রীর গহনাও বিক্রী করতে হলো। ছেলে বি. এ. ক্লাসে ওঠার সাথে সাথে খরচ আরো বেড়ে গেলো। এমনিতেই আলমগীরকে কলেজে ভর্তি করানোর সময়ে আবদুল্লা ঋষিকেশ বাবুর কাছ থেকে কঠিন শর্তে দলিল সই করে টাকা নিয়েছে। থার্ড ইয়ারে ওঠার পর খরচ চালানোর জন্যে আবদুল্লা তামাক

ছেড়ে দিল। অন্যদিকে হোস্টেলে স্টেটাস বাড়াবার জন্যে পুত্র বিড়ি ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরালো। এমনিভাবে সময় যেতে থাকলো। অতিরিক্ত পড়া আর কল্পনার চাপে একদিন হোস্টেলে আলমগীরের ব্রেন আউট হয়ে গেলো।

হোস্টেলে তার উন্মাদনার কারণে হোস্টেল সুপার জাফর সাহেবের টেলিগ্রাম পেয়ে আবদুল্লা একদিন পুত্রকে বাড়ি নিয়ে এলো। বাড়িতে আসার পর আলমগীর সেই ছোট বেলাকার মতো এজলাস সাজিয়ে বিচারের মহড়া দিতে লাগলো। তবে এখন আর পাটির পাখা টানার জন্যে ছোট বোন রাবেয়াকে পাওয়া যায় না। এমনি করে পাগল ছেলের অত্যাচার দিন দিন বাড়তেই লাগলো। ছেলেকে হাকিম বানাবার আশায় গুড়ে বালি দেখে আবদুল্লা ও তার স্ত্রী ফাতেমা একেবারে ভেঙে পড়লো। আলমগীর কখনো পাগলামি করতে করতে মাথায় আঘাত করে রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলতো। এরই মধ্যে একদিন ঋষিকেশ বাবু ক্রোক নিয়ে হাজির হলেন। আবদুল্লার অসহায় অবস্থা দেখে গ্রামের হিংসুক লোকেরা পর্যন্ত ব্যথিত হয়ে ওঠে এবং ঋষিকেশ বাবুকে ক্রোক ফিরিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ করে। ঋষিকেশ বাবু চলে যায়। তবে শর্ত দিয়ে যায় যে, দুই সতীনের চর দখলের সময়ে এলাকাবাসীরা ঋষিকেশ বাবুকে সাহায্য না করলেও মজুমদারের দলে যাবে না। পুত্রের অবস্থার কোন পরিবর্তন হলোনা। আবদুল্লা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিধাতার কাছে তার প্রশ্ন, সে কোনদিন নামাজ-রোজা কাযা করেনি। তবুও কেন তার ওপর এতো লাঞ্ছনা। কিন্তু আবদুল্লা এ-প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

'হাকিম' গল্পটি করুণ রসের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। গল্পের ভেতরে অনেক হাস্যরস পরিবেশনের দৃশ্য আছে এবং পুরো কাহিনীটিই হাস্য-রসাত্মক প্লটের ওপর নির্মিত। শেষ পর্যন্ত গল্পটি বাঙালী সমাজের দরিদ্র পরিবারের করুণ কাহিনী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। গ্রাম্য মহাজনদের শোষণ এবং নিজ স্বার্থে একের বিরুদ্ধে অপরকে ব্যবহার করার চিত্রও এ-গল্পে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের সাধ ও সাধ্যের সীমারেখা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এ-গল্পে ফুটে উঠেছে। দরিদ্র আবদুল্লা ও তার স্ত্রী পুত্রকে হাকিম বানাতে চেয়েছিলো।

কিন্তু পুত্রের মেধা হাকিম হবার জন্যে যথেষ্ট ছিল কিনা সে চিন্তা করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিলনা। তাই সাধ্যাতিরিক্ত শ্রম ও মানসিক চাপের ফলে একদিন পুত্রটি পাগল হয়ে যায়। আবদুল্লার স্বপ্ন একটি শক্ত মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা বলেই তা ধ্বসে পড়ে চোরা-বালির উপর। আবদুল্লার পিতৃহৃদয়ের আশা-ভঙ্গ ও ভাঙা-গড়ার এক বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি হিসেবে গল্পটি সার্থক সৃষ্টি। " 'হাকিম' গল্পটি যখন 'ছায়াবীথি' নামক মাসিকে প্রকাশিত হয় তখন মোহিতলাল মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। গল্পটি পড়ে তাঁর কোন ক্লাসে তিনি নাকি মন্তব্য করেছিলেন: "মুসলমান লেখকের এমন নিজস্ব গল্প এর আগে কখনো পড়িনি।' কথাটা তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্রের মুখেই শোনা। কথাটার দাম সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য।"[৮]

'পরদেশীয়া' প্রথম প্রকাশিত হয় জয়তী, পৌষ ১৩৩৭ সংখ্যায়। শ্যাম্‌স-এর পিতা খুবই প্রগতিশীল বলে সমাজে পরিচিত। তিনি বন্ধুদেরকে হজ্জে না গিয়ে লন্ডন যাবার পরামর্শ দিতেন। এমনিভাবে নিজপুত্র শ্যাম্‌সের জন্যেও তিনি বিলেতী মেম বিয়ে করাতে কোন সমস্যা দেখেন-না। বরং তিনি খুশীই হবেন। কিন্তু শ্যাম্‌সের চাচা বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে ফিরে আসার সময়ে মক্কা শরীফে হজ্ব করে এক আরবী কন্যাকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে আসেন। চাচার ধারণা ছিল, তার পুত্রেরা এবার থেকে সৈয়দ লিখতে পারবে। এ-বিয়েতে শামসুর মা খুশী হলেও তাঁর পিতা খুশী হতে পারলেন না। আরবীয় কন্যাটি এদেশে আসার পর থেকে কিছুতেই শরীর রক্ষা করতে পার-ছিলোনা। ম্যাট্রিক পাস করে ব্যারিস্টারী পড়ার জন্যে বিলেত যাবার প্রাক্কালে চাচীর কংকালসার দেহখানি দেখে শামসু শপথ নিল যে, সে আসার সময়ে একটি বিলেতী মেমকে বিয়ে করে নিয়ে এসে পিতাকে একে-বারে তাক লাগিয়ে দেবে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। শামসু বিলেত থেকে আসার সময়ে মিনিকে বিয়ে করে নিয়ে এলো। এদেশে আসার পর মিনিরও স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। শামসু মিনির স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে মিনিকে মাঝে মাঝে নাচাতো। কিন্তু এর ফলেও কোন লাভ হলো না। মিনি ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে আসতে থাকলো। শামসু মিনিকে নিজ দেশে ফিরে যাবার প্রস্তাব দিলে মিনি তাকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী হলোনা। বরং

শামসুর সাথে সে যে-কোন জায়গাতেই থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করলো। একদিন পিতার আদেশে শামসু অন্তঃসত্ত্বা মিনিকে নিয়ে হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে বিলেত যাত্রা করলো। সেখানে তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মালো। মিনিকে নিয়ে শামসু বিলেতে দুই বছর কাটিয়ে দিলো। ইতোমধ্যে মিনির শরীর ভাল হয়ে উঠলো। দেশে আসার পর মিনির শরীর খারাপ হয়ে যাবার ভয়ে শামসু মিনিকে বিলেতেই রেখে আসতে চাইলো। কিন্তু মিনি কিছুতেই স্বামীকে ছেড়ে থাকতে চাইলোনা এবং একদিন স্বামীর সাথে চলে এলো। এরই মধ্যে শ্যামসের আরবীয় চাচী একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করে। ২।৩ দিন পরের ঘটনা, চাচাসাহেব তখন কাছারীতে। হঠাৎ চাকর-বাকরের হট্টগোল শুনে শ্যামস্ ছুটে গিয়ে দেখে তার চাচী মারা গেছেন। চাচা বাড়িতে আসতেই বৃদ্ধা চাকরানী বলে উঠলো, চাচী মৃত্যু পর্যন্ত দরজার দিকে তাকিয়েছিল এবং মা, মা, করতে করতে মারা গেলো। চাকরানী এ কথাও বললো যে, সে তখন একটুকরা খোরমা মুখে ধরেছিল, কিন্তু চাচী তা ঠোঁটে ধারণ করলোনা। পরে চাচা অনেক দুঃখ করে বললেন যে, আরবী ভাষায় মা অর্থ হলো পানি। পানির অভাবেই আরবীয় চাচীর মৃত্যু হয়েছে।

'পরদেশীয়া' গল্পের প্রেরণা লেখক সমকালীন সমাজ-পরিসর থেকেই নিয়েছিলেন। সেকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক লোকই বার্মা থেকে বিয়ে করে বউ এনেছিলো। লেখকের এক বোনের জা ছিলেন বার্মা রমণী। স্বদেশ থেকে প্রেম-ভালবাসার কারণে প্রেমিক বা স্বামীর সাথে ভিন্ন দেশে এসে ভিন্ন পরিবেশে মহিলাদের যে মানসিক-শারীরিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, লেখক এ-গল্পে তা বর্ণনা করেছেন। নিজস্ব পরিবেশের বাইরে এসে মানুষ কতোটা স্বজনহারা এবং অসহায় হয়ে পড়ে এ গল্পে লেখক তা আরবীয় রমণী এবং বিলেতী রমণী—উভয়ের ক্ষেত্রেই নিরীক্ষা করেছেন। গল্পের সমাপ্তিতে ভাষার ব্যবধান সৃষ্টি করে লেখক গল্পটিকে একটি করুণ পরিণতি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে লেখকদের সার্থকতা সন্দেহাতীত নয়। তদুপরি, গল্পটি পারিবারিক পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উঠে কোন বৃহত্তর জীবনালেখ্যের ব্যঞ্জনা প্রসারিত করেনি। তবুও 'পরদেশীয়া'র চরিত্রটি মৃত্যুর মাঝ দিয়ে পরিণতি লাভ করায় পাঠকের হৃদয়ে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে।

'জয়' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, কার্তিক ১৩৩৪ সংখ্যায়। তখন এর নাম ছিল 'ইসলাম কি জয়।' গল্পের নায়ক সিরাজ বি. এ. পাস করেছে। সে একদিন অধ্যাপক আমীনের বাসায় তাঁর কন্যাকে দেখে পছন্দ করলো এবং মায়ের কাছে গিয়ে তার পছন্দের কথা জানালো। সিরাজের পিতা হাজী সাহেব একজন জমিদার। স্ত্রীর কাছে পুত্রের বিয়ের ব্যাপারে সম্মতির কথা শুনে হাজী সাহেব খুবই খুশী হলেন। কারণ, বহুদিন থেকে চেষ্টা করেও সিরাজকে বিয়ের জন্যে রাজী করানো যাচ্ছিলো না। বলা যায় সিরাজের পিতামাতা তার সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। অন্যপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী গ্রাজুয়েটের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অধ্যাপক সাহেবেরও নারাজ হবার কারণ ছিল না। সিরাজের পিতা একজন গোঁড়া মুসলমান। রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। তিনি নিজেকে ইসলামের একজন একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে মনে করেন। জীবনের সমস্ত সাধনা নিয়ে তিনি নিজেকে ইসলাম প্রচারে ও প্রসারে ব্যাপৃত রেখেছেন। ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তিনি প্রায়ই নামাজান্তে বক্তৃতা করে থাকেন। ঢাকা বা কলকাতা থেকে আঞ্জুমানের প্রচারক, জমিয়তের প্রতিনিধি কিংবা খেলাফতের নেতারা যখন আসতেন তখন হাজী সাহেব নিজ মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে মিছিল করে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন। দেখতে দেখতে সিরাজের বিয়ে ঠিক হলো। একমাত্র পুত্রের বিবাহে যাতে কোন প্রকার ত্রুটি না ঘটে সেজন্যে হাজী সাহেব মহাজনের নিকট থেকে হাজার পাঁচেক টাকা চক্রবৃদ্ধিহারে কর্জ নিয়ে নিলেন। শুক্রবার দিন হাজী সাহেব সকল মুসলমান ভাই ভাই-এর উপর জোর দিয়ে ওয়াজ করেন। সেদিন সন্ধ্যায় হাজী সাহেব বরযাত্রী নিয়ে অধ্যাপক সাহেবের গ্রামের ঘাটে নিরাপদে পৌঁছে গেলেন। ঘন্টা দুই পর মাদ্রাসার মদার্‌রসে আউয়াল অধ্যাপকের বাড়ি ঘুরে এসে বললেন, অধ্যাপকদের পরিবার শিয়া গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমান এবং স্বয়ং কন্যার পিতাকে বুকের উপর হাত রেখে নামাজ পড়তে দেখে এসেছেন। এ-সংবাদ শোনার সাথে সাথে জমিদার হাজী সাহেব নৌকা ফেরাবার আদেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত সিরাজের রোমান্স শিয়া-সুন্নীর ব্যবধানে পড়ে সার্থক হতে পারলো না। বধূশূন্য পাল্কী বাড়ি ফিরে এলো। গল্পটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে স্বল্প পরিসরে শেষ করা হয়েছে।

'জয়' গল্পটির মাঝ দিয়ে আবুল ফজলের সমাজসচেতন শিল্পী-প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মান্ধতা মানুষকে কতোটা সিরিয়াস-ভাবে সংকীর্ণতার দিকে ঠেলে দিতে পারে, তা অতি অল্প পরিসরে এ-গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিরাজ একটি ব্যক্তিত্বহীন শিক্ষিত যুবক হিসেবে পিতার একগুয়েমীর কাছে নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জন দিয়েছে। পরনির্ভরশীল সমাজব্যবস্থায় সমসাময়িক কালে সিরাজের মতো মেরুদণ্ডহীন শিক্ষিত বেকার যুবকের অভাব আজো আমাদের নেই। সিরাজের পিতা হাজী সাহেব একজন জমিদার। এরা জীবনে যা জানতে পেরেছে এবং বিশ্বাস করে নিয়েছে তাকেই সারাজীবনের অবলম্বন হিসেবে চরমভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এরা জীবনকে বোঝার চেষ্টা করেনা। তাই হাজী সাহেবের অনুদার ঐস্‌লামিক সংকীর্ণতার কাছে পুত্রের আশা আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তে উবে গেলো।

'জনক' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, ১৩৩৪ সংখ্যায়। গল্পের নায়ক সৈয়দ আবদুল আলীম চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী ও জমিদার। তিনি এলাকায় পাক্কা মুসলমান হিসেবে পরিচিত। বৃদ্ধ বয়েসে হজ্বে যাবার সময়ে তিনি সমস্ত সম্পত্তি উইল করে চার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের মাঝে ভাগ করে দিচ্ছিলেন। এমন সময়ে এক রমণী একটি ছোট ছেলের হাত ধরে চৌধুরী সাহেবের নিকট হাজির হয়ে আর্জি জানালো যে, তার ছেলের জন্যেও যেন কিছুটা ভাগ রাখা হয়। চৌধুরী এতে রাজি হলেন না। তখন মহিলা সন্তানের পিতৃত্বের দাবি জানিয়ে মামলা দায়ের করলো। কিন্তু শহরের বড় মৌলবী, যিনি গোপনে বিয়ে পড়িয়ে-ছিলেন তার মিথ্যা সাক্ষীতে মামলার কিছুই হলোনা। অগত্যা মহিলা নিজের সন্তানকেই সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করালেন হাকিমের সামনে। হাকিম দেখলেন বাচ্চাটি চৌধুরী সাহেবেরই মতো দেখতে। কিন্তু আইন বেআইনী পুত্র স্বীকার করেনা অজুহাতে মকদ্দমা ডিসমিস করে দিলেন। কিছুদিন পর চৌধুরী সাহেব হজ্বে যাচ্ছিলেন। গায়ে তার লম্বা আলখাল্লা, গলায় জুমদানে নিত্যপাঠ্য কোরানশরীফ ও অজিফা, মাথায় শুভ্র পাগড়ী, বুকভরা শুভ্র দাঁড়ি—দেখতে যেন ঠিকই একজন দরবেশ। এমন সময়ে ছিন্নকন্থা সেই মহিলা তার ছেলে নিয়ে চৌধুরীর দিকে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিলো। চৌধুরী ড্রাইভারকে ট্রেন মিস হবার কথা বলে দ্রুত গাড়ী চালিয়ে যেতে বললেন। গাড়ী দ্রুতবেগে ধেয়ে চললো। গল্প

শেষে গল্পকার গাড়ি স্বর্গের পানে যাচ্ছে বলে ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। 'জনক' গল্পটি 'জয়' গল্পের মতো স্বল্প পরিসরে নিখুঁতভাবে ভণ্ড চৌধুরী সাহেবের চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। ফাতেমার রূপ, সৌন্দর্য, যৌবন একদিন চৌধুরী সাহেবের কাছে লোভনীয় ছিল। চৌধুরীর অবৈধ ভালবাসার ফসল হিসেবে ফাতেমা লাভ করে পুত্র সন্তান। কিন্তু সমাজের প্রভাবশালীদের চিরাচরিত কুটচক্রের শিকার হয়ে ফাতেমা তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারলোনা। শহরের বড় মৌলভী যিনি ফাতেমার সাথে চৌধুরীর বিয়ের প্রহসন পরিচালনা করেছিলেন, স্বয়ং তিনিই এ-বিয়ের কিছু জানেন না বলে সাক্ষ্য দিলেন। এমন কি ফাতেমা যখন তার সন্তানের চেহারা অবিকল চৌধুরী সাহেবের মতো বলে হাকিম সাহেবের কাছে ফরিয়াদ জানালো তাতেও কোন লাভ হলোনা। কারণ হাকিম সাহেব রায় দিলেন যে, আইন কখনো বে-আইনী পুত্র স্বীকার করেনা। এমনিভাবে আজো আমাদের সমাজে অনেক ফাতেমা শুভ্রদাড়ি-ওয়ালা ভণ্ড তপস্বী প্রভাবশালীর লোভ-লালসার চোরাবালিতে দিশেহারা হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানে আজো এদের কথা বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। মাইকেল মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রো' প্রহসনের ভক্তপ্রসাদের স্বগোত্রীয় হিসেবে 'জনক' গল্পের আলীম চৌধুরীর মাধ্যমে আবুল ফজলও সমাজের ভণ্ড তপস্বীদের চরিত্র উন্মোচন করার প্রয়াস পেয়েছেন। ফাতেমার অসহায়ত্বের প্রতি পাঠকের সমবেদনা সৃষ্টির মাধ্যমে গল্পটি অধিকতর সার্থকতা অর্জন করেছে। "নজরুলের খুব প্রিয় ছিল ক্ষুদ্রতম গল্প 'জনক'। ঐটি বের হওয়ার পর তিনি আমাকে ডেকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন আর করেছিলেন অজস্র তারিফ। বলা বাহুল্য নজরুল কারো সম্বন্ধে কোনদিন ওজন করে প্রশংসা করেননি। ওজন করা ব্যাপারটি ছিল তাঁর ধাতের বাইরে।"[৭]

'সংস্কারক' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, ১৩৩৪ সংখ্যায়। অধ্যাপক আলম সর্বত্র নিজেকে নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন প্রবক্তা হিসেবে প্রচার করে থাকেন। অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনে শুনে গল্পের নায়কের ভক্তি দিন দিন বেড়ে গেলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যাবার প্রাক্কালে তাই নায়ক একবার মিসেস অধ্যাপকের পদধূলি গ্রহণের প্রত্যাশায় অধ্যাপকের বাসায় গেলো। অধ্যাপক তখন বারান্দায় পায়চারি করছিলেন নায়ককে একটু দাঁড়াতে বলে ভেতরে দিকে তাকিয়ে কাকে যেনো সরে

যেতে ইশারা করলেন। ঘরে বসে আলোচনা করার সময়ে অধ্যাপক লক্ষ্য করলেন ভেতরের দিককার দরজা দু'টি অঙ্গুলি পরিমাণ ফাঁকা রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে তা বন্ধ করে দিয়ে আসলেন। এরই মধ্যে একবার অন্দরের দিকে চোখ পড়তে চাকরকে ডেকে বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দিতে। সবশেষে নায়ক বিদায় নিয়ে আসার সময়ে অধ্যাপক সামনের রুম থেকে মেয়েদের সরে যেতে বললেন। বিদায়ের পর নায়ক রাস্তায় এসে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, দুইটি আট-দশ বছরের বালিকা সর্বাঙ্গে কাপড় মুড়ি দিয়ে পাল্কীতে উঠছে আর অধ্যাপক ও তার পুত্ররা দুই পাশে দুইটি পর্দা ধরে আছে। তারমধ্যেও অধ্যাপক মেয়েদের বলছিলেন যাতে জাফরীটা বন্ধ করা হয়। না হয় বোরখা দেখা যেতে পারে। এসব দৃশ্য দেখে নায়ক হাসি থামাতে পারেনি। 'জয়' ও 'জনকে'র মতো 'সংস্কারক' গল্পেও আবুল ফজল অতি অল্প পরিসরে বৃহত্তর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। গল্পটি সার্বজনীন আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলেও সমসাময়িক মুসলিম সমাজের পর্দা-প্রথার প্রতি একটি ব্যঙ্গ স্বরূপ। আমরা অনেক সময়ে নিজেদেরকে মুক্তবুদ্ধির ধারক বাহক হিসেবে প্রচার করলেও আজন্মলালিত মজ্জাগত কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। সমাজ-সংসারে এমন কিছু জিনিস আছে যা আমাদের জীবনবিশ্বাসের সাথে নিবিড়-ভাবে মিশে আছে। আমরা চেষ্টা করলেই রাতারাতি এর পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনা। এ-গল্পের অধ্যাপক আলমের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তিনি নিজে অবরোধবাসিনী রমণীকূলের মুক্তির স্বপক্ষে জনমতের সৃষ্টিতে নিয়োজিত থাকলেও নিজেই এর পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত হতে পারেননি। আবুল ফজল ছাত্র জীবনে সলিমুল্লাহ হলে থাকাকালীন সময়ে নারীপর্দা বিরোধী একটি সংঘের সদস্যও ছিলেন। "পর্দা বিরোধী সংঘের (এ্যান্টি পর্দা লীগ) জন্ম হয়েছিল পুরোপুরি ছাত্রদের চেষ্টাতেই। এই পর্দা বিরোধী সংঘের এক সভাতেই আবুল ফজল পাঠ করেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'পর্দা প্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা'। মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত ফজিলাতুন্নেসা তখন কলকাতা বেথুন কলেজ থেকে বি.এ.পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংক শাস্ত্রে এম. এ. পড়ছেন। ফাইনাল পরীক্ষায় ফজিলাতুন্নেছা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলে পর্দা-বিরোধী সংঘের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ফজিলাতুন্নেসার আগে কোনো মুসলমান ছাত্র এই সম্মানের অধিকারী

হতে পারেনি।"[১০] উপরি-উক্ত তথ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আবুল ফজল 'সংস্কারক' গল্পটির মাধ্যমে সমসময়িক মুসলিম সমাজের পর্দা-প্রথা তথা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যঙ্গোক্তি করার প্রয়াস পেয়েছেন।

'মাঠ্যৌষধ' প্রকাশিত হয় 'সবুজ পল্লী', মাঘ ১৩৩৪ সংখ্যায়। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ওপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত হয়েছে। একটি দোতালা বাড়ির উপরের তলায় কয়েকজন হিন্দু এবং নীচের তালায় থাকেন কয়েকজন মুসলমান। উভয় তলার লোকজন যাতে একই পায়খানা ব্যবহার করতে পারে সে জন্যে বাড়ির মালিক মাঝামাঝি উচ্চতায় একটি পায়খানা নির্মাণ করেছিলেন। পায়খানা ব্যবহার নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে একটি মারামারি সংঘটিত হয়ে গেলো। এর জের হিসেবে অনেকেরই ছয় মাস থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত জেল হলো। এরই মধ্যে পরদিন সকালবেলা মুকুন্দ লোটা হাতে পায়খানায় যাত্রা করতেই দেখতে পেলো রহিস পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসছে। এতে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে পুনরায় আরেকটি দাঙ্গা শুরু করার পূর্বে নীচে তাকাতেই দেখলো বন্দুক কাঁধে সান্ত্রী টহল দিচ্ছে। এর ফলে আরেকটি অনিবার্য সংঘর্ষ এড়ানো গেলো। আবুল ফজল এ-গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে চিত্রায়িত করেছেন। অতি সামান্য বিষয় নিয়েও কিভাবে সংঘাত দানা বেঁধে উঠতে পারে এবং সে-সংঘাতের সাথে সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতা যুক্ত হয়ে তা মানুষকে কতোটা উত্তেজিত করে তুলতে পারে, তার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এ-গল্পে।

'আলোছায়া' প্রথম প্রাকাশিত হয় সওগাত, ১৩৩৬ সংখ্যায়। গল্পের নায়ক কাসেম জাহাজে ভ্রমণ করছে। এক বৃদ্ধা মহিলা ভিক্ষা করছিল। সবাই যখন মাফ করতে বলছিল তখন কাসেম লোকলজ্জায় বৃদ্ধাকে সাহায্য করতে পারলো না। ডেকের উপর দু'টি মেয়ে ও দুটি পুরুষ কখনো বিড়ি টানছিলো আবার কখনো তামাক খাচ্ছিলো। মেয়েদের মধ্যে একটির বয়স চৌদ্দ হবে। জাহাজের প্রায় অনেকেই ঘুরে ফিরে এসে এখানে তামাক খেয়ে যাচ্ছিল। লেমোনেড খেয়ে বোতল জমা দিচ্ছিল কাসেম। এমন সময়ে ছোট একটি বালিকা দৌড়ে এসে কুকুরের মতো খেয়ে নিলো কয়েক চুমুক। পরবর্তী স্টেশনে অনেকগুলি কুলি

উঠলো, এরা আসামের চা বাগানে যাচ্ছে। নীচে খালাশীরা ভাত খাচ্ছে। অনেকক্ষণ থার্ড ক্লাসের এ-গাড়ী ও-গাড়ী ঘুরে কাসেম যখন শেষ একটাতে সুটকেস রেখে বসার জায়গা খুঁজছিলো ততোক্ষণ গোয়ালন্দ জাহাজের যাত্রীরা সমস্ত জায়গা দখল করে শুয়ে পড়েছে। লেট্রিনের কাছে দেখা গেলো পাহাড়ী কিশোরী ও তার সঙ্গিনীটি জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। কলবাড়ী স্টেশনে গাড়ী থামতেই কাসেম নেমে পড়লো। মিয়া সাহেব আর বাবু সাহেবেরা সমস্ত জায়গায় এলোপাথারী শুয়ে আছে। এক বাবুর সাথে কাসেমের সংঘর্ষ হলো। কসেম ঘুসি ওঠাতেই বাবু থেমে গেলো। এক স্থানে গাড়ী ধীরগতি সম্পন্ন হলে কাসেম জানালা দিয়ে দেখেলা একটি মেয়ে বুকের মধ্যে কি যেন চেপে ধরে দৌড়ে আসছে। কাসেম কাল বিলম্ব না করে মেয়েটিকে টেনে ওঠালো মেয়েটির কান্নাকাটি থামার পর বোঝা গেল যে, তার স্বামী আসামের এক চা বাগানে কাজ করতো। হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তার স্বামী মারা যাবার পর সন্তানটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চট্টগ্রাম চলে যাচ্ছে। হাতে টাকা পয়সা নেই তার। কাসেম কয়েকবার মেয়েটিকে একটু বসার জায়গা দেবার জন্যে কয়েকজনকে অনুরোধ করে অপ্রত্যক্ষ-ভাবে সমালোচিত হয়েছে। এক সময়ে কাসেম উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে বসতে দিলো, সীতাকুণ্ড স্টেশনে ট্রেন থামার পর কাসেমের ইচ্ছা হয়েছিল বাচ্চাটিকে কিছু খাবার কিনে দেয়, কিন্তু লোকলজ্জার ফলে তা হয়ে উঠলোনা। ইতিমধ্যে আশে-পাশের লোকজন এমনিতেই নানা প্রকার কুরুচিপূর্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে আনন্দ উপভোগ করতে থাকলো। এমনি অবস্থার মধ্যে কাসেম এক সময়ে ট্রেন থেকে নেমে দ্রুত চলে গেল নিজ গন্তব্যে। ঈদের পূর্বদিন কাসেম সেই মেয়েটিকে দেখলো এক সওদাগরের দোকানে ভিক্ষা করতে। পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনে কাসেম চাকর ছেলেকে সামনে বাড়াতে বলে বস্তার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলো, মেয়েটি বলছে, সে গত চারদিন যাবত উপোস রয়েছে। সওদাগর সাহেব চাকরকে পাঠালেন নিকটস্থ মসজিদের ইমামের কাছে একথা জানতে যে, রোজার সময়ে বে-রোজদারীকে ভাত ভিক্ষা দেয়া যাবে কি না। চাকর এসে জানালো যে, এর ফলে কবিরা গুনা হবে। সুতরাং সওদাগর সাহেব ভিক্ষুক মেয়েটিকে শূন্যহাতে বিদায় করে দিয়ে নামাজ পড়তে চলে গেলেন। কিন্তু রমজান মাসে পাপ-পুণ্যের তোয়াক্কা না করে কাসেম মেয়েটিকে পাশ্ববর্তী হিন্দু দোকানে নিয়ে

খাবার কিনে দিয়ে চলে গেলো। এ-গল্পে আবুল ফজল বিস্তারিতভাবে পরিবেশ বর্ণনা করার কৌশল অবলম্বন করেছেন। কাসেমের জাহাজ ও ট্রেন-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে গল্পকার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে গল্পের বাস্তবতা আনায়নের জন্যে ব্যবহার করেছেন। মানবতা ও ধর্মীয় চেতনাকে আবুল ফজল এ-গল্পে যুগপৎ ব্যবহার করেছেন। অধিক মাত্রায় সমাজ-সংস্কার ও মানবতার বক্তব্য উপস্থাপনে উৎসাহী হবার কারণে গল্প অনেক স্থানেই প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছে। এ-গল্পটি পাঠেও মনে হয় একটি বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্যেই যেন আবুল ফজল গল্পটি রচনা করেছেন।

'শরীফ' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, আষাঢ় ১৩৩৬ সংখ্যায়। সোহাগী শরীফ ঘরের কন্যা। সোহাগীর মা শরাফতীর কারণে পাড়া-প্রতিবেশীদের সামনে কোনদিন যায়নি। এটা তার গর্ব। শরীফদের লেখা-পড়ার দরকার নেই, কেবল মাত্র একটু-আধটু উর্দু জানলেই চলবে। এটাই তাদের ধারণা। সোহাগীর পিতার কড়া দৃষ্টি, নিয়ম-কানুন আর শরাফতীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তার ভাইয়েরা শেষ পর্যন্ত রেঙ্গুন, আকিয়াব, ঢাকা ও কলকাতায় পালিয়ে গেল। শরীফ ঘরের মেয়ে অধিক বয়স পর্যন্ত ঘরে রাখা যাবে না। তাই এগার বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেই পার্শ্ববর্তী গ্রামের মীর্জা নূর আলীর পুত্রের সঙ্গে সোহাগীর বিয়ে সম্পন্ন হলো। কন্যার বিয়েতে চার পুত্রের কেউই উপস্থিত ছিলনা বলে সোহাগীর মায়ের দুঃখের সীমা ছিলনা। সারা শরীরে গহনা পরে টলতে টলতে সোহাগী স্বামীর বাড়ি যায়। মাস দুই মাস বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে। পিতার শরাফতীর দৌরাত্ম্যে তাকে নিশীথ রাতেও বোরখা পরে আসতে হয়। সোহাগীর ভাইয়েরা কেউ বাড়ি আসে না। এবার মায়ের মরণাপন্ন অবস্থা বলে খবর পাওয়াতে বড় ছেলেটি বাড়ি এসেছে। সে ভেবেছিল তার পিতা এবার আর পূর্বের মতো বাড়াবাড়ি করবেন না। এদিকে সোহাগী আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে উঠলো। মায়ের খুব শখ প্রথম সন্তান প্রসবের সময়ে সোহাগী যেন বাপের বাড়িতে থাকে। সোহাগীর বড়ভাই শুক্রবারে তাকে আনার কথা পাকাপাকি করে এলো। রাত্রে খাবারের পর সোলতান পিতাকে যাত্রা করার কথা বলতে, এখনো মানুষ চলাচল বন্ধ হয়নি বলে পিতা অপেক্ষা করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত রাত দুইটার দিকে পিতা-পুত্র সোহাগীকে নিয়ে যাত্রা করলো।

সোহাগী স্বামী আদর করে স্ত্রীকে বিদায় দিল। পথে সোলতান বাতি জ্বালাতে চেয়ে পিতার কাছ থেকে ধমক খেলো। পিতার ধারণা বাতি জ্বালালে লোকজন মেয়েলোক দেখে ফেলতে পারে। তারপরও গাঢ় অন্ধকারের কথা বলে সোলতান আরেকবার বাতি জ্বালাবার প্রস্তাব করতেই পিতার কাছে "হারামজাদা শুয়ার কা বাচ্চা' বলে গালি খেলো। এতে সোলতান বুঝতে পারলো যে, তার পিতা এখনো শরীফ রয়ে গেছেন। তাই সোলতান লণ্ঠনটা রাস্তার উপর রেখে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলো। পিতা একমনে কি যেন ভাবতে ভাবতে সামনে হাঁটতে হাঁটতে পিতা এবং কন্যার মধ্যেকার দূরত্ব একসময়ে বেড়ে গেলো। হঠাৎ শাঁ শাঁ করে পেছন থেকে কি যেন ছুটে আসছিলো। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সোহাগী কিছুই আঁচ করতে পারলো না। তদুপরি আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা থাকার কারণে সে কোন দিকে ভালভাবে বোঝার পূর্বেই মোটর গাড়ী পেছন থেকে তাকে দলে চলে গেল। পিতা পেছন ফিরে সব বুঝতে পারলেন কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকে সোলতান ততক্ষণে স্টেশনের রাস্তায় উঠে গেছে। এমনি করে শরাফতীর সংকীর্ণতার নিষ্পেষণে সোহাগী তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে নিয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় লাভ করলো। বংশের আভিজাত্য একশ্রেণীর মানুষকে করে তোলে উন্মাদ। এরা পরিবর্তনশীল পৃথিবীর গতিধারার সাথে তাল না মিলিয়ে নিজেদেরকে অতীতের চিন্তা-চেতনা ও সংকীর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সুখ পেতে চান। একমাত্র শরাফতীর বাড়াবাড়ি সহ্য করতে না পেরেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ছেলেরা চার ভাই একসাথে পিতার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে গেলো। একমাত্র শরাফতীর কৌলিন্যকে জাহির করতে গিয়ে সেকেলে পিতার স্বেচ্ছাচারিতা ও গোঁড়ামীর যূপকাষ্ঠে কন্যাকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হলো। এ-গল্পের মাঝেও আবুল ফজলের সমাজ-সংস্কারক মন কাজ করেছে।

'আহমদ' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, মাঘ ১৩৩৭ সংখ্যায়। আহমদ খুনের আসামী। ঘরে বাইশ বছরের স্ত্রী জোলেখা ও শিশুপুত্র ফরহাদকে রেখে সে যাবজ্জীবন খাটতে গেলো। দুঃখ সইতে না পেরে জোলেখা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চেয়েছিলে। কিন্তু শিশুপুত্র ফরহাদের কথা ভেবে সে আবার জীবনের দিকে এগিয়ে এলো। পনের বছরের

হাঁড়ভাঙা খাটুনীর পর আহমদ ছাড়া পেল। বাড়ি পেঁাছার জন্যে জেলকর্তা আহমদকে চারটি টাকা দিয়েছিল। টিকেট কেনার পর তার হাতে একটি আধুলি অবশিষ্ট ছিল। পুত্র ফরহাদের জন্যে খেলনা কেনার জন্যে সে আধুলিটি নিয়ে নিজের স্টেশনে নেমে দেখলো এক বৃদ্ধা ভিখারিনী। আহমদ বৃদ্ধার অবস্থা দেখে তা তাকে দান করে দিল এবং নিজে খালি হাতে বাড়ি না গিয়ে কয়েকদিন শহরে থেকে কিছু রোজগার করার সিদ্ধান্ত নিল। কয়েকদিন কুলিগিরি করে সে কিছু অর্জন করলো। বাড়ি ফিরে উঠানে পা রাখতেই আহমদ দেখলো পশ্চিম পাশে একটি কাঁচা কবর। শিয়রে মোমবাতি জ্বলছে। ঘরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলো তার বৃদ্ধা স্ত্রী ছিন্নকন্থা পরিধান করে একটি জীর্ণ জায়নামাজের উপর নামাজ পড়ছে। আহমদ ফরহাদ বলে চীৎকার করে ধড়াস করে পড়ে গেলো। 'আহমদ' গল্পটি আবুল ফজলের স্বল্প পরিসরে রচিত গল্পসমূহের মধ্যে একটি। গল্পটি করুণ রসের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। খুনের আসামী আহমদ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করেও যেন হত্যার প্রায়শ্চিত্য শোধ করতে পারেনি। পরিশেষে পুত্রের জীবনদানের মাঝ দিয়েই যেন আহমদের হত্যার ঋণ শোধ করতে হলো।

'রহস্যময়ী প্রকৃতি' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, ১৩৪৫ সংখ্যায়। গল্পের নায়িকা ফুলি বা ফুলমতি গরীব চাষী মজিদের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ফুলির পর মজিদের আরো তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে। তিন বছর বয়সের সময়ে ফুলির কাঁশি হয়েছিল। পরে তা হাঁপানীর রূপ ধারণ করে এবং কিছুতেই নিরাময় করা সম্ভব হলোনা। এ-কারণে ফুলিকে কোথাও বিয়ে দেয়া সম্ভব হলোনা। তাই বাকী তিন বোনের বিয়ে তাকে বাদ দিয়েই দেয়া হলো। অথচ, সকল বোনের বিয়ের সময়ে ফুলি সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করেছে এবং এতেই সে আনন্দ লাভ করে তৃপ্তি পেয়েছে। এরই মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা দুলি দুইটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যায়। দুলি ছিল গরীব ব্যবসায়ী বশিরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। পর পর তিনটি স্ত্রী মারা যাবার পর পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে বউ-খেকো বলে ইয়ার্কি মারতে শুরু করলো। বশির দূরের হাট থেকে বেতের তৈরী ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করে দূরের গ্রামসমূহে সামান্য মুনাফায় বিক্রী করতো। এতে তার সংসার ভালভাবেই চলে

যেতো। দুলির মৃত্যুশয্যাতেই শরৎ কবিরাজ বশিরকে পরামর্শ দিয়েছিল ভাল একজন জ্যোতিষের শরণাপন্ন হতে। কিছুদিন পর বশির চক্রধরপুর গিয়ে কামাখ্যা থেকে আগত জ্যোতিষের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে পারলো তার চতুর্থ স্ত্রী এক বছরের মধ্যে মারা যাবে এবং পঞ্চম স্ত্রী দীর্ঘজীবী হবে। এতে সে দুঃখ পেল এবং পঞ্চম স্ত্রীর আয়ু চতুর্থ স্ত্রীতে স্থানান্তর করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। যাহোক, কোন রকমে একবছর পার করে পরবর্তী বছরে ভাল ঘরে ভাল মেয়ে বিয়ে করা যাবে, এ-মানসে বশির প্রাক্তন স্ত্রীর বড়বোন ফুলিকে বিয়ে করে নিয়ে এলো। স্বামীর সংসারে এসে ফুলি হাঁপানীর খুস খুস রোগে সর্বদা একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো। ইতোমধ্যে ফুলির মৃত্যু কামনায় বশির জ্যোতিষ কবিরাজের কাছে ধর্ণা দিয়েছে, মসজিদে মানত করেছে, এমন কি ফুলির কাফনের কাপড়ের জন্যে প্রতিবেশী ফুফাতো ভাই গুনুর কাছে পাঁচ টাকা জমাও রেখেছে। প্রায় প্রতিরাতেই ফুলি যতোই স্বামী-সান্নিধ্য কামনা করেছে ততো বেশী করে সে স্বামীর কাছ থেকে দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার ভোগ করেছে। অন্যপক্ষে ফুলিও রোগ-মুক্তির জন্য বিভিন্ন স্থানে মানত করতো। শেষ পর্যন্ত একদিন ফুলির রোগমুক্তি ও সন্তান-লাভের ভিতর দিয়ে বশিরের পঞ্চম স্ত্রী লাভের সম্ভাবনা নির্মূল হলো। তারপর বশির ধীরে ধীরে ফুলিকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো। ফুলির জীবনে একটা অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে বশিরের জীবনের পরিবর্তন এলো। বশির যে ফুলিকে সত্যিকার অর্থে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণই করতে পারেনি কিংবা ফুলি এক বছরের অধিক বেঁচে থাকতে তা বিশ্বাস করতে পারেনি সে ফুলিকে নিয়েই তাকে সুখের সংসারের স্বপ্ন রচনা করতে হলো। ফুলি চরিত্রটি আবুল ফজলের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। হাঁপানীর জন্যে ফুলি কথা বলতে পারেনি। স্বামীর সমস্ত অত্যাচার সে নীরবে একজন মূক পল্লীবালিকার মতো সহ্য করে গেছে। ফুলি ভালবেসে জীবনের স্বাদ উপভোগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ-সুখ ভোগ করতে চেয়ে তাকে প্রতি রাতে স্বামীর অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে। লেখকের ভাষায় কোন কোন রাতে তাকে খেকী কুকুরের মতো কাৎরাতে কাৎরাতে ঘর হতে বের হয়ে দেউড়ী ঘরের বাইরে রাত কাটাতে হয়েছে। এতো অপমান আর গঞ্জনার পরেও ফুলি জীবনকে জয় করে নিলো। শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে সে জয়ী হলো। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সে নারীর পরম গৌরব মাতৃত্বের

অধিকারিনী হলো। আবুল ফজলের সৃষ্টিনৈপুণ্যের কারণে ফুলি চরিত্র গ্রামবাংলার এক অসহায় নারী চরিত্র হিসেবে পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করে। "মানবতাবাদী শিল্পী আবুল ফজলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'রহস্যময়ী প্রকৃতি'। রচনারীতির দিক থেকে এমন নিখুঁত ছোটগল্প আবুল ফজলের কমই আছে। অন্নদাশংকর রায় অত্যন্ত যথার্থ-ভাবেই মন্তব্য করেছিলেন—'রহস্যময়ী প্রকৃতি গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ (আবুল ফজলকে লিখিত ব্যক্তিগত পত্র: ১৩/১১ ৪২)। গল্পটির রস আস্বাদনের পথে কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করেছে গল্পে ব্যবহৃত উপভাষা।"[১১]

'নবাব-আমীর-বাদশাহ' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, পৌষ ১৩৩৫ সংখ্যায়। 'চোর' প্রকাশিত হয় মোহম্মদী, ১৩৩৬ সংখ্যায়। 'পরিণাম' প্রকাশিত হয় সওগাত, বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় এবং 'দুই রাত্রি' প্রকাশিত হয় সঞ্চয় (ঢাকা), ১৩৩৬ সংখ্যায়। 'নবাব-আমীর-বাদশাহ' গল্পটিকে 'আয়ষা' গল্পের পরিপূরক বলা যেতে পারে। 'পরিণাম' গল্পে শরাফতী বজায় রাখতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিতে হলো। বনেদী ঐতিহ্যের ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে কলকাতার কড়োয়াবাসী নবাব-বংশধরদের অমিতব্যয়িতার কারণে সর্বহারাদের পর্যায়ে নেমে যেতে হলো। নবাব-আমীর-বাদশাহ গল্পে উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে মৌলবী সাহেবের মিথ্যা ফতোয়া প্রদান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'আয়ষা' গল্পেও আমরা এ-ধরনের অসৎ মৌলবীর ফতোয়া প্রদান লক্ষ্য করেছি। পরিণাম গল্পে ধনাঢ্য তনয়ের পতনের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে নারী ও মদ। 'মাটির পৃথিবীর'র প্রায় সবকটি গল্পেই লেখক সমাজসচেতন শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। তবে, 'চোর' এবং 'দুই রাত্রি' গল্প দু'টিতে লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় ততোটা প্রকাশিত হয়নি।

'মাটির পৃথিবী' সম্পর্কে কলকাতার দেশ পত্রিকা যা ছেপেছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "বাংলাসাহিত্য ক্ষেত্রে আবুল ফজল বিশেষ পরিচিত নহেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বাংলা সাহিত্য তাঁহাকে বাদ দিয়া অসম্পূর্ণ। আবুল ফজল খুব পাকা লেখক নহেন। তাঁহার লেখায় অজস্র কাঁচা গাঁথুনি আছে। কিন্তু মুসলমান সমাজের এমন সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য চিত্র বড় চোখে পড়েনা। কেবল চিত্র হইলে একথা বলা চলিত না। তিনি সেই চিত্রাঙ্কনকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছেন।

আবুল ফজলের 'মাটির পৃথিবী' বাংলা সাহিত্যে বিস্মৃত হইবার বস্তু নয়।"[১২] অবশ্য ১৩৪৮ সালের উপর্যুক্ত মন্তব্যের পর আবুল ফজল বাংলা সাহিত্যে অনেক দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করেছেন এবং নিজেকে তাঁর সময়কালের একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'মাটির পৃথিবী'র গল্পসমূহে আবুল ফজল সামাজিক অবিচার, যৌনতা, প্রেম, প্রকৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মনস্তত্ত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের সমস্যাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'মাটির পৃথিবী' সম্পর্কে লীলা রায়ের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য: In 'Earthern World', a collection of short stories by Abul Fazal, the author shows examplary courage in writing in the dilect of his characters, Eastern Bengal Mussalmans. It is strong and pungent with a raciness that is rewarding to the preserving reader for it is rough going at first to uncustomed ears. The life of the eastern Bengal Mussalman is as rich as it is untapped and world of its women is totally unknown. With a genuine sense of humour Abul Fazal tells us in 'The Smile' how the persistent and knowing smile of a small pupil upset his school-teacher to the point of resignation and departure. In the 'Ayesha' we see a truly beautiful woman. Poor, semi-literate, living among people as mean and quarrelsome as they well could be, she is untainted and so is her daughter. 'Mysterious Nature' is elemental. Phulmati, an asthomatic but passionate girl, is the fourth wife of her husband. She not only survives the year a Sadhu has given her to live but is cured of her asthma and presents her husband with his first son. The husband, who has merely tolerated her in the hope of a fifth and long-lived wife as the Sadhu promised, indulges freely in wife-beating and cursing and is most refractory until his son conqueres him.[১৩]

"আয়ষা" আবুল ফজলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। এ-গ্রন্থে মোট তেরটি গল্প সংকলিত হয়েছে। পূর্ববর্তী গল্পগ্রন্থ 'মাটির পৃথিবী' থেকে নয়টি গল্প

বাছাই করে এর সাথে নতুন চারটি গল্প যোগ করে 'আয়েষা' প্রকাশ করা হয়। 'আয়েষা' গ্রন্থে সংযোজিত নতুন চারটি গল্প হলো : নিজের মা ও পরের বাপ, উচ্চ ও তুচ্ছ, পুত্রার্থে ভার্যা ও তিন বিয়ের এক ফল।

'নিজের মা ও পরের বাপ' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, ১৩৫০ সংখ্যায়। চৌধুরী সাহেব খান সাহেব খেতাব পেয়েছেন এবং বাহাদুর হয়ে সরাসরি খান বাহাদুর হবার পরিকল্পনা আঁটছিলেন। এমন সময়ে অন্দরমহল থেকে খবর এলো যে খোকা কুয়োতে পড়ে গেছে। চৌধুরী সাহেব এক-মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে লুংগি মালকোচা করে ঝাপ দিতে উদ্যত হলে শুনতে পেলেন তার নিজের ছেলে নয়, ঝি'র ছেলে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ মাল-কোচা খুলে তিনি পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং ঝি'কে গালি-গালাজ করতে লাগলেন। হঠাৎ করে সে-সময়ে চাকর ছেলেটা বাজার থেকে ফিরে এলে তাকে দিয়েই ঝি'র ছেলেটিকে উদ্ধার করা হয়। চৌধুরী সাহেব স্ত্রীর কোল থেকে নিজ পুত্রটিকে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। কারণ সে আজ কুয়োতে পড়েনি এবং এটা নিশ্চয়ই খোকার জন্যে একটা কৃতিত্ব। ঝি'র ছেলে মারা গেলে চৌধুরীকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যেতো এ-অজুহাতে শেষ পর্যন্ত চৌধুরী সাহেব ঝি'কে দায়িত্বহীনতার দায়ে বরখাস্ত করে দিলেন। এতে ঝি ভেঙে পড়লো না বরং খুশী হয়ে ছেলেকে আদর করতে লাগলো। ঝি'র নির্বিকার আচরণে চৌধুরী আরও রেগে গেলেন। এ-গল্পে আমরা একজন ভণ্ড সমাজসেবীর পরিচয় পাই। চৌধুরী সাহেব খান বাহাদুর হবার স্বপ্ন দেখছেন কিন্তু নিজের মনটাকে আত্মচিন্তার ঊর্ধ্বে প্রসারিত করার শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। সমাজে এমন লোকের অভাব নেই যারা পরোপকারী সেজে মানুষের উপকার করতে যায়; কিন্তু তাদের সকল কর্মের পেছনেই স্বীয় স্বার্থ ক্রিয়াশীল থাকে। গল্পের সমাপ্তিতে চৌধুরীর সিদ্ধান্তের প্রতি ঝি'র নির্বিকার আচরণ যেন চৌধুরীর প্রতি চপেটাঘাত স্বরূপ। "নিজের মা ও পরের বাপ গল্পে অপত্যস্নেহকে কেন্দ্র করে মানুষের স্বার্থপরতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই সঙ্গে এই সত্যও গল্পটি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাৎসল্যপ্রীতির প্রশ্নে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ নেই। ধনী চৌধুরী সাহেব এবং তাঁর দরিদ্রা ঝি সন্তানপ্রীতির প্রশ্নে একই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে এই গল্পের মধ্যে। সামাজিক জীবনের বৈষম্য স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে গিয়ে টিকতে পারেনি।"[১৪]

"উচ্চ ও তুচ্ছ' প্রকাশিত হয় সওগাত ১৩৫০. সংখ্যায়। আসগর সরকারী অফিসের পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানী। তার বয়স চৌত্রিশ/ পঁয়ত্রিশ হবে। দশ বছর আগে সে চিররুগ্না রাহেলাকে বিয়ে করেছে। তাদের কোন সন্তান নেই। স্ত্রীর জন্যে প্রায়ই ডাক্তারের ভিজিট দিতে দিতে এবং বাসা ভাড়া দিয়ে তার হাতে কোন টাকাই অবশিষ্ট থাকেনা। একদিন বড় মাছের মুড়ো খাওয়ার সখ হলে আসগর পনের আনা দিয়ে একটি মুড়ো কিনে বাড়ি রওয়ানা হলো। আজ রোববার। তাই আসগর বাজারে যেতে পেরেছিল। অন্যদিনের মতো আজো বউয়ের এটা না সেটা, একটা অসুখ হয়তো লেগেই থাকবে এ ভয়ে আস্তে করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই চাকর বললো কিছুক্ষণ আগে রাহেলা মারা গেছে। আসগর নিজের অতি সামান্য সঞ্চয় এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা যোগাড় করে কোন রকমে স্ত্রীর সৎকার করলো। দাফন সেরে গোসল করে ঘরে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। এক সময়ে আসগর ইজি চেয়ারে শুয়ে আরাম করে একটা বিড়ি ধরালো। প্রতিবেশী ও অফিসের সহকর্মী হামিদ এসে আসগরকে রাতের খাবারের দাওয়াত দিতেই আসগরের মনে পড়লো সকাল বেলাকার সেই মাছের মুড়োর কথা। তাই সে রাতে খাবেনা বলে হামিদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। হামিদ চলে যাবার পর আসগর চাকর কালাকে মাছের মুড়ো রান্না হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিলো, মরাবাড়িতে রান্না নিষেধ। তাই সে ওটা হামিদ সাহেবের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং রাতে হামিদ সাহেবের বাড়িতে আসগরের সাথে তাকেও দাওয়াত করা হয়েছে। আসগর এজন্যে কালার উপর খুবই রাগান্বিত হলো। কারণ সে ইতোমধ্যে হামিদ সাহেবের ওখানে যাবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কালাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হলো। এক পর্যায়ে আসগর সারাদিনের সঞ্চিত বেদনার প্রকাশ হিসেবে কাঁদতে শুরু করলো। এ-কান্না দেহের জন্যে না মনের জন্যে, প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্যে নাকি এক সের এক ছটাক ওজনের তুচ্ছ বস্তুর জন্যে তা নির্ধারণের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে লেখক গল্প শেষ করেছেন। 'উচ্চ ও তুচ্ছ' গল্পটি যুদ্ধের বাজারে একজন স্বল্প বেতনভোগী কেরানীর জীবনালেখ্য। আসগর একদিন রাহেলাকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল। কিন্তু অল্প কয়েক বছর পরে একটি সন্তানের জন্ম না দিতেই রাহেলা মারা গেল। রাহেলার প্রতি আসগরের ভালবাসার অভাব ছিলনা। নিত্য অভাবের সংসারেও

একটু ভাল খাবার লোভ আসগর সংবরণ করতে পারেনি। তাই, সে রুই মাছের মুড়োটা কিনে এনেছিল। শেষ পর্যন্ত এটা খাওয়াও তার ভাগ্যে কুলোলনা। সে ভালবেসে বা সখ করে যেটাই ভোগ করতে গেছে তাতেই পড়েছে বাধা। হয়তো-বা ভাগ্যের পরিহাসের কারণেই সে গল্পের শেষে কেঁদেছে। এটা আমাদের সাধারণ কেরানী-জীবনের ট্র্যাজেডী। গল্পটিতে মানুষের মনের উচ্চ ও মহৎ অভিব্যক্তির পাশাপাশি জৈবিক চাহিদাকে বড়ো করে প্রকাশ করা হয়েছে। গল্পে তুচ্ছের কাছে উচ্চের পরাভব দেখানো হয়েছে। "যুদ্ধের কল্যাণে আমাদের শাশ্বত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কী নির্মমভাবে ভেঙে গুড়ো হয়ে গেছে এই গল্পে তার পরিচয় ধরা পড়েছে। আসগরকে তার স্ত্রী বিয়োগে সান্ত্বনা দিতে এসে হামিদ 'বিড়িটা জ্বালিয়ে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে আসগরের ডান হাতটায় জোরে একা ঝাঁকুনি দিয়ে ফের বললো—বাক্ আপ্ ইয়ংম্যান। এক বৌ যাবে, আর এক বৌ আসবে আসগরের সিংহাসন, না না তক্তপোষ খালি নাহি রবে। তারপর হো হো করে নিজের রসিকতায় নিজেই একচোট হেসে নিল।' প্রিয়জনের মৃতুতে কাউকে সান্ত্বনা দেওয়ার এই ভাষা মানবতাবিরোধী যুদ্ধের তমসাচ্ছন্ন পরিবেশেই সম্ভব।"[১৫]

'পুত্রার্থে ভার্যা' প্রথম প্রকাশিত হয় সওগাত, শ্রাবণ ১৩৫৪ সংখ্যায়। প্রথমে এর নাম ছিল 'পিয়ার চেয়ে প্রিয়'। 'আয়ষা' গল্পগ্রন্থে 'পুত্রার্থে ভার্যা' নামে ছাপানো হয়। গল্পটিতে চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াস ততোটা লক্ষ্য করা যায়না। কাহিনী বর্ণনাই গল্পটাতে প্রাধান্য লাভ করেছে। গল্পের শেষ ভাগে বক্তব্যের গভীরতা তেমন একটা নেই বরং তা অনেকটা হালকা কমিক ধরনের হয়ে উঠেছে। এটি আবুল ফজলের আলোচনা-যোগ্য গল্প নয়।

'তিনবার' সওগাতে ছাপা হয়েছিল। 'আয়ষা' গল্পগ্রন্থে এর নামকরণ করা হয় 'তিন বিয়ের এক ফল।'। ঝানু এডভোকেট মি: সেনের কন্যা স্নেহলতা খুবই লাজুক স্বভাবের মেয়ে। তাকে নিয়ে পরিবারের কারো কোন ভাবনা নেই। কিন্তু অর্থনীতির নতুন প্রভাষক ইন্দু এ-কলেজে বদলী হয়ে এসে নিজের অজান্তেই স্নেহলতার প্রেমে পড়ে গেলো। এক-দিন প্রেমের পথ ধরে অধ্যাপক অরবিন্দ'র বাসায় এসে ছাত্রী-শিক্ষক দুজনে বোঝা-পড়া শেষ করে কোর্টে গিয়ে সিভিল মেরীজ সেরে নিল।

এ-বিয়ের ফল ভাল হলোনা। কলেজের স্বার্থে মেয়েকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার জন্যে মি: সেন চিঠি পেলেন আর অন্যপক্ষ প্রভাষক ইন্দু ডি. পি. আই.-এর কাছ থেকে পত্র পেল অন্য কলেজে বদলীর। এ-সুযোগে স্নেহলতার পিতা মি. সেন ৬ মাসের রেসিডেন্সের কথা উঠিয়ে বিয়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। ঘটনার পরিণতি এড়াবার জন্যে স্নেহ-লতার মামা শরৎবাবুর সহযোগিতায় ইন্দু ও স্নেহলতা দ্বিতীয়বার হিন্দু মতে বিয়ের কাজ সেরে নিল। এতেও বাঘা উকিল মি: সেন দমে গেলেন না। তিনি প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন যে, হিন্দুশাস্ত্র মতে অসবর্ণ বিয়ে সিদ্ধ নয়। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে ইন্দু ও স্নেহলতা অধ্যাপক রহিমের বাসায় গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তৃতীয় বারের মতো বিয়ে করে নিল। মুসলমান হয়ে তারা পরস্পর নাম রাখলো ওসমান ও আয়ষা। একসময়ে তাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মালো। ছেলের নাম রাখা হলো—যিশু, কানু এবং কৃষ্ণ আহমদ। শেষ পর্যন্ত পিতার স্নেহের কাছে সব বাধা দূর হয়ে গেলো এবং মিঃ সেন জামাই ও কন্যাকে গ্রহণ করে নেন। পিতার বাড়িতে গিয়ে স্নেহলতা ছেলের নাম শুকতারা রাখার প্রস্তাব করলো। কিন্তু পিতা মিঃ সেন তাকে ধূমকেতু নামকরণ করলেন। গল্পটি মিলনান্তক। এর নামকরণ ধূমকেতু কিংবা শুকতারা রাখা যেতো। গল্পটিতে দু'জন তরুণ-তরুণীর প্রেম এবং ভালবাসার মাধ্যমে বিয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা ভালবেসে মনের স্বাভাবিক আকর্ষণে পরস্পরকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু একজন কায়স্থ এবং একজন বৈদ্য হওয়ার ফলে হিন্দুমতে তাদের সামাজিক বিয়ে সম্ভব হবেনা বিধায় তারা সিভিল ম্যারিজ সম্পন্ন করে। কন্যার পিতা আইনের লোক, তাই আইনের ফাঁক বের করে এ-বিয়ে চ্যালেঞ্জ করলে তারা হিন্দুমতে সামাজিক বিয়ে সেরে নেয়। কিন্তু এতেও তারা রক্ষা পেলোনা। অসবর্ণ বিয়ের বিরুদ্ধে কন্যার পিতা আইন খাটাতে প্রস্তুত হলেন। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' এবং 'মাটির পৃথিবী' গল্পেও সন্তানের আগমনে শান্তির সূচনা হয়েছিল। এ-গল্পেও স্নেহলতা সন্তান লাভের মাধ্যমে পিতৃকুলের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। "বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব যেমন আছে তেমন আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সচেতনতা থাকলে গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট সম্পদ হতে পারত। এই গল্পে আবুল ফজলের মানসমুক্তির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। চিন্তাধারায় বরাবরই

মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন হলেও এই গল্পে মানবতার আরো উদারতার পটে শিল্পী আবুল ফজলের আত্মমুক্তি ঘটেছে।"১৬

গল্পটিতে ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে প্রেমকে স্থান দেয়া হয়েছে। ইন্দু এবং স্নেহলতা সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নিজেদের প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনবার তিন রীতিতে বিয়ে করেছে। ধর্মীয় বাধা, সামাজিক আচার কিংবা আইনের বেড়াজাল তাদের চলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করলেও টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি। মানবজীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত কোন বাধাই আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কেন ? তা-ও শুধু পরস্পরকে পাওয়ার জন্যে। এভাবে আবুল ফজল গল্পটিতে মানব-ধর্মকেই প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। শিশুর নামকরণের ভেতর দিয়েও গল্পকার সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে মানবসন্তানের জয়গান গেয়েছেন।

"শ্রেষ্ঠগল্প" গ্রন্থটিতে 'মাটির পৃথিবী' ও 'আয়ষার' একুশটি গল্পের সঙ্গে আরো নয়টি গল্প যোগ করে মোট তিরিশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। নতুন নয়টি গল্পের নাম হলো—সতীর সহমরণ, কুমারী এ-মা, কবিতার অপমৃত্যু, রাহু, সাক্ষী, সিতারা, প্রেম ও মৃত্যু, বিবর্তন এবং দ্বিতীয়বার।

'সতীর সহমরণ' প্রকাশিত হয় সওগাত, ১৩৪০ সংখ্যায়। জহর সদ্য ল' পাস করা যুবক এখনো মাসে মাসে পিতা বাড়ি থেকে টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাই বিশেষ একটা ভাবনা-চিন্তা নেই। সামনের বাসার মেয়েটির নাম ছায়া। জহর তাকে ভালবাসে। সুযোগ পেলেই জহর জানালার ফাঁক দিয়ে ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকতো কিংবা চাকরের মাধ্যমে প্রেমের কথা লিখে পত্র পাঠাতো। ছায়ার কাছ থেকে জহর এ-ব্যাপারে কোন সাড়া পেতোনা। কারণে-অকারণে জহর ছায়াদের বাসার দিকে তাকিয়ে অনেক সময় নষ্ট করেছে। এরই মধ্যে একদিন জহরের পরিচয় হলো পাশের বাড়ির বিপত্নীক শ্রীমন্ত বাবুর সঙ্গে। তিনি ইনকাম ট্যাক্সের হেডক্লার্ক, বয়স ষাটের উপর এবং চাকুরীর বয়স পঞ্চাশের নীচে। পরিচয় হবার পর থেকে শ্রীমন্ত বাবুর সাথে জহরের সখ্যতা ধীরে ধীরে বেড়েই চললো। শ্রীমন্তবাবু এসে প্রায় প্রতিদিনই তার বিবাহিত জীবনের অতীত কাহিনী বর্ণনা করে জহরের

অনেক সময় নষ্ট করতে লাগলো। এতে জহরও একদিন সিদ্ধান্ত নিল যে, যেমন করেই হোক শ্রীমন্ত বাবুকে একটা বিয়ে দিতে হবে। জহরের মুখে বিয়ের কথা শুনে শ্রীমন্ত বাবুর মন উথলে উঠলো। তিনি বিয়ের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্যে ছেলে-মেয়েদের খাবার-দাবারের অসুবিধার কথা তুললেন। শেষ পর্যন্ত জহর সামনের বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেই শ্রীমন্ত বাবু দ্বিতীয় মেয়ে অর্থাৎ ছায়াকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করলো। ছায়ার বড় বোন নাকি কোন একটা কেলেংকারী করে এখন কাশীতে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে আছে। জহরের হস্তক্ষেপে তারই প্রেমিকা ছায়ার সাথে একদিন শ্রীমন্ত বাবুর বিবাহ সম্পন্ন হলো। বিয়ের পর শ্রীমন্তবাবু আর ঘর থেকে বের হতোনা কিংবা তার খোঁজে জহর বাসায় গেলেও বলা হতো যে, সে বাড়ি নেই। তরুণী ভার্যা নিয়ে শ্রীমন্ত বাবু যখন মশগুল ঠিক সে সময়েই হঠাৎ করে তার শরীরের অসুস্থতা বাড়তে লাগলো। পরিশেষে একদিন শ্রীমন্ত বাবু দেহত্যাগ করলেন। ছায়ার বৈধব্যে জহর হয়তো স্বস্তি পেয়েছিল, কিন্তু ছায়া সবাইকে অবাক করে শেষ মুহূর্তে স্বামীর চিতায় নিজেকে বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করলো যে, হিন্দুর বিয়ে দেহগত নয়, শাস্ত্রগত।

ছায়ার আত্মবলিদানের পর জহর নিজের মনে ধিক্কৃত হলো এই ভেবে যে, যাকে এতোদিন সে প্রলোভন, অনুনয়-বিনয়, আবেদন, ইশারা, কিংবা চিঠি লিখে প্রেম নিবেদন করেছে, সে সব কিছুরই ঊর্ধ্বে। পর দিনের ডাকে জহর ছায়ার একটি চিঠি পেল। তাতে ছায়া মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নিজের জীবনের অনেক কথা লিখে গেছে। ষাট বছরের শ্রীমন্তের সাথে ছায়ার মনের বা দেহের কোন মিল ছিলনা। ছায়ার বড়বোনের কাছে শ্রীমন্তবাবুর ছেলে প্রেম নিবেদন করেছিল। শেষ পর্যন্ত ছায়ার বোনকে কাশীবাস নিতে হয়েছিল। ছায়া এতদিন জহরের সবক'টি চিঠি পেয়েছে। চিতায় যাবার পূর্বে চিঠিগুলো পুড়িয়ে ছাইগুলো আচলে করে সে নিয়ে গেছে। ছায়ার অতৃপ্ত আত্মার সাথে জহরের প্রেমের ভষ্মও মিশে গেলো শ্মশানে। 'সতীর সহমরণ' গল্পটিতে ব্যঙ্গ-রসাত্মক আবহ সৃষ্টির মাধ্যমে অন্তঃসারশূন্য সমাজকে সমালোচনা করা হয়েছে। শ্রীমন্ত বাবুর ছেলে শ্রীনাথ ছায়ার দিদিকে প্রেম নিবেদন করায় তার কিছুই হয়নি বরং ছায়ার দিদিকেই সমাজ পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

ষাট বছরের বৃদ্ধের সাথে ছায়ার বিয়েতেও সমাজ কোন আপত্তি তোলেনি। ছায়ার সহমরণে তার পিতা কমল বাবু নিজেকে ধন্য মনে করেছে। পাড়া-পড়শীরা শ্রীমন্ত বাবুকে ছায়ার স্ত্রীর পতি হওয়াকে সৌভাগ্যের মনে করেছে। কিন্তু, ছায়া চেয়েছিল মৃত্যুকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে দিদির অপবাদ কিছুটা ঘোচাতে। জহর ছায়াকে ভালবেসেছিল। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনে ছায়াকে বিয়ে করতে হলো এক ঘাটের মরাকে। গল্পটির গাঁথুনি স্লথ হওয়ার কারণে এবং অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে কোন কোন স্থানে নীরস মনে হয়। সর্বশেষে চিঠির মাধ্যমে ছায়ার মনের যে আকুতি লেখক বর্ণনা করেছেন তা সত্যিই পাঠকদের ভাবিত করে: "যে ছায়াকে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখে জহরের মনে হয়েছে 'সাধ্বী, সতী, মহিমাময়ী' ইত্যাদি সেই সতী রমণী ছায়া কিভাবে তার বধূ জীবনেও অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত ছিল তার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়েই গল্পের সমাপ্তি।"[১৭]

'কুমারী এ-মা' প্রকাশিত হয় বুলবুল ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায়, ১৩৪১ সালে। বুলবুলে গল্পটির নাম ছিল 'সবের শব'। এম. এ. পাশ করা কুমারীকে নিয়ে গল্পটি লেখা হয়েছে বলেই এর নাম 'কুমারী এ-মা'। নায়ক এ-মাকে ভালবাসতো। এ-মা তার পরিবর্তে উড-বি ব্যারিস্টারকে পছন্দ করতো। নায়ক তিন বছর বিলেতে থেকে ফিরে এলো। তার আশা ছিল বন্ধু উড-বি ব্যারিস্টার এবং এ-মা হয়তো তাকে দেখতে আসবে। কিন্তু তাদের কোন খবর পাওয়া গেলোনা। এদিকে নায়ক ইউরোপ থেকে একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রলোভন দিয়ে মসৌরীতে এনে বসিয়ে রেখেছে। হঠাৎ নায়ক দেখলো গেট খুলে একটি মোটা মেয়ে ভেতরে ঢুকছে।

নায়ক বুঝতে পারলো যে, এ-মা ভেতরে আসছে। এ-মার কথা থেকে বোঝা গেল যে, অধিক মেলামেশার ফলে উড-বি তার সর্বনাশ করেছে। উড-বি তাকে রক্ষা করাতো দূরে থাক, বরং চাকর দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এ-মা নায়ককে সন্তানের পিতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালো। কিন্তু নায়ক তখন মসৌরীর চিন্তায় ব্যস্ত। এ-মা এক সময়ে নায়ককে অপছন্দ করে উড-বি'র কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে উড-বি'র হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না।

তাই নায়ক সময়মতো এ-মাকে আক্রমণ ও মৃদু আঘাত করতে ছাড়েনি। এমনকি স্বামী-লাভের আগে সন্তান-লাভে উতলা হবার কারণ নেই বলেও নায়ক এ-মাকে অপমান করেছে। কুমারী এ-মা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো।

'কুমারী এ-মা' গল্পটিতে সিরিয়াস কোন ব্যঞ্জনা নেই। পুরো গল্পটিতে তথাকথিত অভার-স্মার্ট নারীদের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গল্পের প্রথম ভাগে এম.এ. ডিগ্রীধারী কুমারী এ-মা নায়ককে পাত্তা না দিয়ে উড-বি ব্যারিস্টারের পেছনে পেছনে ঘুরেছে। কারণ সে মনে করতো উড-বি ব্যারিস্টার একটি সংস্কারমুক্ত আধুনিক ব্যক্তিত্ব। এ-মা নিজেকে ভাবতো আধুনিক কালের ইসাডোরা হিসেবে। লাগামহীন ঘোরাঘুরির ফলে একদিন এ-মা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে এবং উড-বি-এর কাছে কোন সহানুভূতি বা স্বীকৃতি না পেয়ে সে আধুনিক জীবনকে ধিক্কার দিয়ে ব্যাক-ডেকেট নায়কের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ততোদিন সময় অনেক দূরে পেরিয়ে গেছে। নায়ক বিলেত থেকে আসার সময়ে এক বিদেশিনীকে বিয়ে করার কথা বলে এনে মসৌরীতে বসিয়ে রেখেছে। পরিবারের সম্মতি মিললেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে এ-মাকে কোন সাহায্য করতে পারলো না। এ-মার দম্ভভরা মেকী ব্যক্তিত্ব গল্পটিতে হাস্যরসের যোগান দিয়েছে। নারী-স্বাধীনতা একটা নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করার পর কিভাবে একজন মহিলাকে সর্বনাশের পঙ্কে নিমজ্জিত করতে পারে তারই চিত্র গল্পকার এ-মা চরিত্রের ভেতর দিয়ে পরিস্ফুটন করেছেন। গল্পটির প্রথম অংশ অতিকথন-ভারাক্রান্ত এবং শেষের অংশ অতিদ্রুত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এ-গল্পের বক্তব্য আমাদের সমাজজীবনের গভীর কোন সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেনা। শুধুমাত্র এ-মা চরিত্রের অতি-স্বাধীনতা ও মুক্ত-বিচরণপ্রবৃত্তিকে একটি সমস্যাসংকুল পরিণতির দিকে প্রসারিত করে দেয়াই যেনো এ-গল্পের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

'কবিতার অপমৃত্যু' প্রকাশিত হয় জয়তী, বৈশাখ ১৩৩৯ সংখ্যায়। মাহবুব কবিতা লেখে। তার স্ত্রী নাহার। মাহবুব স্ত্রীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে এবং ভালবাসে। ধীরে ধীরে মাহবুবের প্রেমে ভাটা পড়লো। এখন সে ভাবে এক বছর আগে নাহারের জন্যে কি পাগলামীটাই করেছে।

হয়তো-বা নাহারকে লক্ষ্য করে লেখা কবিতাসমূহ একত্রিত করলে একটা অভিধানের সমানই হয়ে যাবে। আজকাল মাহবুবের কাছে দশটা পাঁচটা অফিস যা, দশটা-পাঁচটা দাম্পত্যজীবনও তাই। এরই মাঝে হঠাৎ একদিন বেড়া দিয়ে ঘেরা পুকুর ঘাটে কোন এক রমণীকে স্নানরতা দেখে মাহবুবের আগ্রহ বেড়ে গেলো। পশ্চাতে আবার স্ত্রী না এসে পড়ে তাই লুকিয়ে লুকিয়ে মাহবুব সদ্যস্নাতা রমণীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকলো। তার মনে হচ্ছিল, সে হয়তো-বা এখনি একটি কবিতা লিখে ফেলতে পারে। সবশেষে মাহবুব যখন আবিষ্কার করলো যে, তার লুকিয়ে দেখা অপ্সরীটি তারই স্ত্রী নাহার তখন তার বুকের সকল উত্তাপ-উৎসাহ নিমেষে দমে গেলো। অথচ এক বছর আগে কিংবা মুহূর্তকাল পূর্বেও সে রমণীটিকে লক্ষ্য করে কবিতা লিখতে পারতো। স্বল্প পরিসরে রচিত এ-গল্পটিতে একটি চিরন্তন সত্যকে রূপ দেয়া হয়েছে। তা হলো, আমরা যা পাই বা পেয়ে যাই তার কদর আমরা করিনা। যা পেলাম না কিংবা পাওয়া সম্ভব নয় তার জন্যেই আমাদের শাশ্বত আগ্রহ। পরকীয়া প্রেমের একটি চিরকালীন আবেদন রয়েছে। রমণীর পরকীয়া প্রেম পুরুষকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, কিন্তু সেই নারীকে প্রাপ্তির ভেতর দিয়ে পুরুষের আগ্রহ ভাটা পড়ে যায় কিংবা একটু বৈরাগ্য এসে যায়। গল্পটিতে সাইকো-এনালিটিক্যাল ট্রিটমেন্ট আছে। ক্ষুদ্র আয়তনের এ-গল্পে মানবমনের চিরন্তন প্রকৃতি ও অতৃপ্তবাসনা অতি চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে।

'রাহু' প্রকাশিত হয় 'মাহে নও' পত্রিকায়। হাসান একজন বেসামরিক সরকারী আমলা, জেলাশহরে তার পোস্টিং। হাসানের পূর্বতন স্ত্রী মারা যাবার পর একমাত্র কন্যা রাজিয়া বা রাজুকে নিয়েই তার সংসার চলছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দ্বারপরিগ্রহ না করে হাসান বেশিদিন থাকতে পারলোনা। শেষ পর্যন্ত কালেকটর সাহেবের ঘটকালিতে এডিশনাল জজ মতিন সাহেবের কন্যা রাহেলাকে হাসান বিয়ে করলো। রাহেলা তখন ঢাকায় আই.এ. পড়ছিলো। রাহেলাকে ঘরে আনার পর থেকেই কন্যা রাজিয়াকে রাহেলা সহ্য করতে পারছিলো না। তার ওপর হাসানের সাথেও রাহেলার সম্পর্ক তেমন একটা নির্ঝঞ্ঝাট যাচ্ছিল না। রাহেলা যখনই হাসানের কাছাকাছি যেতে চেয়েছে তখনই তার মনে হয়েছে হাসান এবং তার মাঝখানে যেন রাজিয়ার মা শুয়ে আছে। একদিন রাহেলা বলে বসলো যে, সে গাড়ী চালনা শিখবে। ঠিক হলো ডি. এস. পি.

মকসুদ সাহেবের কাছে রাহেলা ড্রাইভিং শিখবে, কারণ মকসুদ সাহেবের নিজস্ব গাড়ী আছে। এরই মধ্যে একদিন শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে রাহেলা পার্টিতে গেলোনা। কিন্তু পরে দেখা গেলো যে, সে মকসুদের সাথে গাড়ী চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হাসানকে বাধ্য হয়েই রাহেলার ড্রাইভিং প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে হলো। গাড়ীচালনা বন্ধ করে দিলেও মকসুদ-রাহেলার সম্পর্ক অবাঞ্ছিত ভাবে ঘনিষ্ঠহতে লাগলো। হাসান নিজের শিশুকন্যার কাছে সকল রিপোর্ট পেয়ে রাহেলার প্রতি কঠোর হয়ে উঠলো এবং হাসানের অপ্রত্যাশিত আঘাতে একদিন রাহেলার একটি মৃত কন্যাশিশু জন্মগ্রহণ করলো। এরপর থেকে রাহেলা হাসানকে হত্যাকারী হিসেবে জানতো এবং বিশ্বাস করতো। রাহেলা একসময়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে মতলব আঁটতে থাকে। একটা কেইস তদন্তের জন্যে হাসান দিন দুয়েকের জন্যে মফঃস্বলে গেলে রাহেলা পরিকল্পিতভাবে রান্নাঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এবং নিজহাতে গায়ে কেরোসিন নিক্ষেপ করে হাসানের শিশুকন্যা রাজুকে হত্যা করে।

প্রাথমিকভাবে হাসান হত্যার জন্যে রহেলাকে দায়ী করার কথা চিন্তাও করেনি। শেষ পর্যন্ত রাহেলা নিজেই আত্মদংশনে জর্জরিত হয়ে এলোমেলো কথা বলতে থাকে এবং সে ভাবতে থাকে যে, হয়তো-বা হাসান তাকে ধরে ফেলেছে। হাসান কিন্তু নির্বিকারভাবে স্বামীর দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকে। রাহেলা নিজ হাতে কেরোসিন ঢেলে রাজিয়াকে হত্যা করার কারণে সে নিজের হাত সাবান দিয়ে বার বার ধুয়ে শুঁকতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত রাহেলার চিকিৎসার জন্যে হাসানকে ঢাকায় সেক্রেটারিয়েটে বদলী হয়ে আসতে হলো। রাহেলার দৈনন্দিন মানসিক অবসাদগ্রস্ততার কারণে হাসান প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। একেকবার ভাবে, তার যদি সঙ্গতি থাকতো হয়তো সে স্ত্রীকে চিকিৎসা করানোর জন্যে বিলেতে নিয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত রাহেলা নিজেই মুখ খুলে বলে ফেললো যে, হাসান তাকে কন্যা হত্যার দায়ে দায়ী ভাবছে কিনা? গল্পের শেষ পর্যায়ে হাসান রাহেলার মনোভাব বুঝতে পারে এবং বলে যে, বাইবেলের সেই বাণীতে সে বিশ্বাস করে: 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।' এতে রাহেলা হাসানকে মহৎ বলে অভিহিত করে।

'রাহু' একটি পারিবারিক-মনস্তাত্ত্বিক গল্প। হাসান প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর একমাত্র কন্যা রাজুকে নিয়েই মশগুল ছিল। এমনকি

প্রথমার চিন্তাতেই সে বিভোর ছিল। রাহেলা এসেই হাসানের প্রচলিত পারিবারিক জীবনে একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো সব তছনছ করে দিলো। রাহেলা শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না। তাই সে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। সংসারে একচ্ছত্র প্রতিপত্তি বিস্তার করার পথে প্রথম বাধা হিসেবে সে চিহ্নিত করেছিল রাজুকে। অন্যপক্ষে হাসানের নিঃস্পৃহতা ও অতীতচারিতা তাকে টেনে নিয়ে গেছে মকসুদের মতো ধুরন্ধর সুযোগসন্ধানী লোকের কাছে। রাহেলার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েও অস্বীকৃত পথে ধাবিত হয়ে চলে গেছে মকসুদের কাছে। রাজুকে হত্যা করার পর রাহেলার আত্মদংশন রাহেলা চরিত্রের বিশিষ্ট দিক। একটা অপূরণীয় সর্বনাশের ভেতর দিয়ে রাহেলা যে-আত্মদর্শন লাভ করেছে তা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। গল্পটি বেশ বড় আকারের হলেও ঘটনাপরম্পরায় এর গতি কোথাও থেমে যায়নি। অনেকগুলো ধারালো সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে গল্পের চরিত্রগুলো সজীবতা লাভ করেছে। "রাহু' গল্পটি একটি পারিবারিক জীবনের মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী। মনস্তত্ত্বগত কারণেই রাহেলা-হাসানের পারিবারিক জীবনে একটা যে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছিল স্বামী কিংবা স্ত্রী কোন পক্ষেই সময়োচিত সাবধানতা অবলম্বিত না হওয়ায় সেই দ্বন্দ্ব আরো জটিল রূপ ধারণ করে সংসারে একটা দারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। শেষে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়ে সংসারে শান্তি নেমে এসেছে।"[১৮]

'সাক্ষী' প্রকাশিত হয় 'বর্ষবাণী'তে। পরে 'প্রেক্ষিত' পত্রিকায় গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়। বন্দিনী জোহরাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে জল্লাদেরা। সঙ্গে রয়েছে তিনটি কুকুর। গলাপর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর নিক্ষেপ করে আর বুভুক্ষু কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করা হবে। জোহরার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, সে নাকি পতিতা। মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে জোহরাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ-দৃশ্য দেখে কেউ কেউ বলাবলি করছিলো, ওই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পতিতা জোহরাকে। পথিমধ্যে সান্ত্রীরা এক কূয়ো থেকে জল পান করলো। অথচ জোহরা জল চাইতেই তারা পতিতাকে জল দিলে গুনাহ হবে বলে নিষেধ করে দিল। জোহরা তখন তিন দিনের ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোর জন্যে জল চাইলো। তাতেও ফল

না হওয়ায় সে নিজেই ওড়না ছিঁড়ে রশি তৈয়ার করে কুয়োর তলদেশ থেকে জল উঠিয়ে ওড়না নিঙড়ে কুকুরগুলোকে খাওয়ালো। জোহরা কিছুক্ষণ পরেই প্রাণ হারাবে, তাই পানির অপচয় হবে মনে করে সে পানি পান করলো না। এরপর থেকে কুকুরগুলো জোহরার পা শুঁকে শুঁকে হাঁটতে লাগলো। বধ্যভূমিতে পৌঁছাবার পর জোহরার আবক্ষ নিমগ্ন শরীরে দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে কুকুর তিনটি তিন দিক থেকে আড়াল করে রাখলো। জল্লাদেরা একের পর এক পাথর নিক্ষেপ করে কুকুরগুলোকে মরণাপন্ন করে তুললো। কিন্তু তাতেও এরা সরলোনা একটুও। দ্রুত সংবাদ পাঠানো হলো খলিফার কাছে। তিনি এসে সব শুনে রায় দিলেন যে, যেহেতু কুকুর বোবা প্রাণী, তাই তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেবেনা। বরং বাক্পটু মানুষই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। অতঃপর জোহরা মুক্তি লাভ করলো। 'সাক্ষী' গল্পটি একটি হাদিসের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে। জোহরা চরিত্র মৃত্যুকে জয় করে মানবীয় গুণাবলী লাভ করেছে। 'রাহু' গল্পেও আবুল ফজল পাপীর পরিবর্তে পাপকে ঘৃণা করেছেন। এ-গল্পেও আমরা দেখতে পাই যে, পতিতাবৃত্তির দায়ে সমাজ জোহরাকে দণ্ড দিচ্ছে কিন্তু তার অংশীদার পুরুষের প্রতি সমাজ নির্বিকার রয়েছে। মানুষ সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করতে পারে কিন্তু বোবা প্রাণীর দ্বারা তা সম্ভব হয় না। এ-গল্পে নীতিবাদী আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি প্রচলিত হাদিসের কাহিনী নির্ভর করে রচিত এ-গল্পে লেখক সংক্ষিপ্ত পরিসরে জোহরা চরিত্রকে এক অবিস্মরণীয় মাহাত্ম্য প্রদানে সক্ষম হয়েছে। আধ ঘণ্টা পরে প্রাণ হারাবে, একথা নিশ্চিত জেনে জোহরা মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পানি পান করে অপচয় করেনি। তাই, সে অভুক্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল। এর ফলে জোহরা চরিত্রটি মানবীয় গুণাবলী লাভের মাধ্যমে পাঠক হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।

'দ্বিতীয়বার' গল্পটি প্রকাশিত হয় মাহে নও পত্রিকায়। খান পরিবারের আদুরে সন্তান ওয়াজেদ মহা ধূমধাম করে ফিরোজাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে আনে। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন ওয়াজেদ এক অজানা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে ওয়াজেদের সাথে ফিরোজার বচসা শুরু হয় এবং এর জের হিসেবে

ফিরোজাকে একদিন তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ৭/৮ বছরের পুত্র মারুফকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করতে হলো। পুত্রের অস্বাভাবিক কার্যকলাপ দেখে শোকে-দুঃখে একদিন ওয়াজেদের মা ইহলোক ত্যাগ করেন। নিরাশ্রয়ী ফিরোজা মারুফকে নিয়ে শহরের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্রয়দাতা ব্যবসায়ীর পাঁচটি সন্তান রয়েছে এবং তার বড় মেয়েটি বিয়ে হয়েছে। এ-সত্ত্বেও ব্যবসায়ী হায়দার ফিরোজাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। ফিরোজা একের পর এক কৌশল এঁটে বিয়ের সময় পিছাতে থাকে। এর মধ্যে ওয়াজেদ লোক পাঠিয়ে এবং নিজে এসে কয়েকবার ফিরোজাকে বাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। হায়দারকে ওয়াজেদ প্রথমে সাধাসাধি, পরে ভয় এবং পরিশেষে যতো টাকা খরচ হয়েছে তার ডবল টাকা ফেরত দেবারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হলোনা। শেষ পর্যন্ত ওয়াজেদ কোর্টে নালিশ করলো। কোর্ট ওয়জেদের পক্ষে রায় দিল তবে পুলিশ দিয়ে ছেলেকে ধরিয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি দিল না। তাই, ছেলে ও মাকে ছেড়ে যেতে রাজী হলো না। এরই মধ্যে হায়দার বিয়ের জন্যে ফিরোজাকে আরেকবার চাপ প্রয়োগ করে। এবার ফিরোজা বললো যে, মারুফের অনুমতি এখনো মেলেনি। এভাবে বছর পেরিয়ে যেতে থাকলো। পরিশেষে কোরবানীর ঈদের সময়ে ওয়াজেদের অনুরোধে হায়দার রাজি হলো ফিরোজাকে একদিনের জন্যে বিয়ে করে তালাক দিতে। বিয়ের পূর্বমুহূর্তে ওয়াজেদের স্ত্রী জোহরা এক শর্ত দিল যাতে মারুফের সাথে তাদের এক কন্যার বিয়ে দিয়ে পরস্পর এক আত্মীয়-তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এভাবে নয়ন পুরের খাঁ বাড়িতে ইসলামী ইদ্দত অনুসারে ফিরোজা আবার স্বামীগৃহে অধিষ্ঠিত হলো। এ-দিকে ওয়াজেদের ঔরসে নূরবিবির কোন সন্তান না হওয়ায় মারুফই খান বংশের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হলো।

'দ্বিতীয়বার' গল্পটি সহজ সরল ভাবে গতানুগতিক ভঙ্গিতে রচিত। চরিত্রস্খলনের কারণে ওয়াজেদের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে। হায়দার একজন সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী। ফিরোজার রূপে মুগ্ধ হয়ে সে হিতাহিত জ্ঞান ভুলে গিয়েছিল। এবং একসময়ে জানাজানি হয়ে গেলে ফিরোজার ভালবাসা পাবার জন্যে তার ভেতর ব্যক্তিত্ব জেগে ওঠে। ফিরোজা ওয়াজেদকে দশজন বাঙালী রমণীর মতো ভালবাসতো, তাই

হায়দারের প্রলোভনে সে ভেঙে পড়েনি। গল্পের শেষ ভাগে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেবার মাধ্যমে আত্মীয়তা গড়ে তোলার পরিকল্পনাটি একটি সস্তা আবেগের প্রকাশ কিংবা গল্পের খাতিরে কাহিনী প্রলম্বিত করার প্রয়াস বলে মনে হয়। গল্পটিতে লেখক চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা না চালিয়ে একে একটি কাহিনীনির্ভর গল্পে পরিণত করেছেন।

'বিবর্তন' প্রথমে দৈনিক 'সংবাদের কোন এক ঈদ সংখ্যায় প্রকাশের জন্যে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ছাপানো না-হওয়ার কারণে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'উদয়ন' পত্রিকায় গল্পটি জন্মান্তর নামে ছাপা হয়। পরবর্তীকালে লেখক আরও কয়েকটি গল্পের মতো এ-গল্পেরও নাম পরিবর্তন করে 'বিবর্তন' নামকরণ করেন। হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন বিয়ের পর স্ত্রী ফরিদাকে গভীরভাবে ভালবাসেন। সন্তান লাভের পর স্বাভাবিক কারণে ফরিদার শরীরে সৌন্দর্যের ঘাটতি দেখা দেয়। মৌলানা সাহেব একান্ত মানবিক কারণে পাশের বাড়ির এতিম লুলা মেয়ে লুলিকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেন, যাতে সে দু'বেলা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। একদিন নিজের অজান্তে মৌলানা সাহেব লুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি পাপকার্য থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে চারদিকে লুলির বিয়ে খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু দুইশত টাকা পণ ধার্য করে ঘোষণা দেয়ার পরও কোন আগ্রহী প্রার্থী লুলিকে বিয়ে করার জন্যে এগিয়ে এলোনা। এদিকে মৌলানা সাহেব নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলোনা। একরাতে মৌলানা সাহেবের আদিম পাশবিক ক্ষুধার মুখে লুলির দেহ বিলীন হয়ে গেলো। তারপর লুলির ঘরে মৌলানা সাহেবের আগমন একটা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। এ-ভাবে ছয়মাস পেরিয়ে গেলো। লুলির দেহে এলো নতুন পরিবর্তন। অবস্থা বেগতিক দেখে সাত দিনের মধ্যেই হজ্বে যাবেন বলে মৌলানা সাহেব ঘোষণা প্রচার করলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই মিলে অল্প সময়ের মধ্যেই মৌলানাকে প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা জোগাড় কেরে দিল। কিন্তু, হজ্ব যাত্রার পূর্বদিন মৌলানা সাহেব কাউকে কিছু না বলে হাজী ক্যাম্প থেকে লাপাত্তা হয়ে যান।

পনের দিন পর মৌলানা সাহেব বাড়ি ফিরে আসেন এবং লুলিকে বিয়ে করার কথা ঘোষণা দিয়ে সবাইকে অবাক করে দেন। এ ধরনের ক্রিয়াকর্মের জন্যে সর্বসাধারণের কাছে মৌলানা সহেবের ইমেজ নষ্ট

হয়ে যায় এবং এর ফলে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়। নিজের ভাইবোনেরাও তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যার যার অংশের জমিন ভাগ করে নিয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ির সাথেও সম্পর্ক নষ্ট হলো। অস্তিত্বের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে মৌলানাকে লাঙ্গল ধরতে হলো। মৌলানার কলেজ-পড়ুয়া শ্যালক, যাকে তিনি কমিউনিস্ট বলে আক্রমণ করতেন, সেই কবীরই এসে মৌলানাকে অভিনন্দন জানিয়ে লুলিকে আপার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলো।

'বিবর্তন' গল্পটি আবুল ফজলের মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার এক সফল সৃষ্টি। গল্পের নায়ক হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন ভাল রেজাল্ট করার পর সমাজে সুনাম অর্জন করেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও তাকে নিয়ে গর্ব করতো। ফরিদার বয়স মওলানার অর্ধেকের চাইতে বেশী নয়। অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে নিয়ে মোহাম্মদ হোসেন বেশ ভালভাবেই সংসার চালাচ্ছিলেন। মওলানা সাহেব স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাকে খুব ভালবাসতেন। এ-কারণে তিনি বিয়ের পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই সময়মতো উপস্থিত হতে পারতেন না। পরে অবশ্য তার এ ধরনের বিলম্ব আর হতো না। গল্পটিতে হাফেজ মওলানা সাহেবকে প্রথম থেকেই লেখক একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী মোহাম্মদ হোসেন হাফেজ হয়ে গ্রামের মাদ্রাসায় হেড মৌলভী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এক ভাই হাফেজ হওয়াতে অন্যান্য ভাইদেরও মর্যাদা বেড়ে যায়। একাধারে হাফেজ এবং মওলানা হওয়ার কারণেই মুন্সীবাড়ির মেয়ে ফরিদার সঙ্গে মোহাম্মদ হোসেনের বিয়ে হয়েছিল। লুলিকে এতিম হিসেবে মোহাম্মদ হোসেন যখন আশ্রয় দিয়েছিলেন তখন তা একান্ত মানবিক কারণেই দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের যৌন-অতৃপ্তি থেকে মওলানা যখন একরাতে লুলির ঘরে গিয়ে হাজির হলো তখন সেটা একান্ত যৌন সম্ভোগপ্রসূত তাড়না থেকেই সংঘটিত হয়েছে। রক্তমাংসে গড়া একজন সবল ব্যক্তির কাছ থেকে এ-ধরনের আচরণ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অপরপক্ষে লুলিও তখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল এ ধরনের একটা রঙিন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। অন্যথায় লুলির কাছে থেকে কোন প্রকার বাধা-প্রাপ্ত হলে মওলানা সাহেব শেষ পর্যন্ত এতদূর অগ্রসর হতেন কিনা সন্দেহ। স্বাভাবিকভাবেই নিষিদ্ধ

আনন্দের প্রতি মওলানা সাহেবের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং তা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সমাজজীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি মানুষ যে ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করে থাকি, ঠিক একই ধরনের আচরণ হয়তো আমরা একান্ত নির্জনে কিংবা সুযোগ পেলে না-ও প্রদর্শন করতে পারি। এখানে আবুল ফজল সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন সফল ধর্মভীরু ব্যক্তির ব্যক্তিমানসের নিভৃত এলাকায় আলোকপাত করার সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন। যে মওলানা দিনের বেলায় সকলের সামনে লুলির সাথে মনিব চাকরানীর অভিনয় করেছেন সে মওলানাই প্রকারান্তরে রাতের অন্ধকারে ইনফরমাল ভাবে নিজেকে সপে দিচ্ছেন সমাজ-অবহেলিতো পঙ্গু লুলির বুকে। মওলানার লাম্পট্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা লুলির নেই। কারণ লুলির কাছ থেকে সে ধরনের ব্যক্তিত্ব প্রত্যাশিত নয়। লুলির শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে মওলানা সাহেব প্রথমত ঘাবড়িয়ে যান এবং হজ্বে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজের অপকর্মকে সাময়িকভাবে চাপা দিতে চেয়েছিলেন। হজ্বযাত্রার মতো একটি মহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের প্রাক্কালে মওলানা সাহেবের মনে মানবিক চিন্তার উদয় হয় এবং সে স্বেচ্ছাতাড়িত হয়েই লুলিকে বিয়ে করার কথা ঘোষণা করে। মওলানার এ-ধরনের সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে তার ওপর আত্মীয়-স্বজনেরা ক্ষুব্ধ হয় এবং ফলশ্রুতিতে নেমে আসে আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয়। মওলানা সাহেব লাঙ্গল ধরলেন। প্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রমের মর্যাদা। লুলি যখন মওলানা সাহেবের বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর নাদুস-নুদুস হয়ে উঠলো তখন একদিন নগ্নবক্ষা লুলি মওলানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বাস্থ্যহীন স্ত্রীর সাথে তুলনা করে লুলির প্রতি মওলানার মতো স্বাস্থ্যবান সবল পুরুষের আকৃষ্ট হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু মওলানা সাহেব সাথে সাথেই লুলিকে বিয়ে দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এখানে মওলানা-চরিত্রের মহত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। সাময়িক সমাধানের প্রত্যাশায় মওলানা সাহেব লুলিকে পশ্চাতে ফেলে হজ্বে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েও বাড়িতে ফিরে এসে লুলিকে বিয়ে করার কথা ঘোষণা করেন। এখানেও মওলানা চরিত্রটি মহৎ ব্যক্তিত্বের পরিচয়বাহী। শেক্সপীয়রীয়ান ট্র্যাজেডীর মতো মওলানা সাহেবের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে গল্পের প্রথমভাগে যে বিপর্যয় দেখানো হয়েছে তাতে মওলানা সাহেবের প্রতি পাঠকের ঘৃণা ও করুণাই কেবল সৃষ্টি হয়। গল্পের শেষভাগে মওলানাকে

একজন ন্যায়বান এবং শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে গল্পকার মওলানা মোহাম্মদ হোসেনের প্রতি পাঠকমনে যথেষ্ট সহানুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। গল্পের বর্ণনাভঙ্গি চমৎকার, ভাষা সাবলীল এবং সংলাপ রচনা বাস্তবানুগ হয়েছে। 'বিবর্তন' আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম।

উল্লিখিত 'দ্বিতীয়বার,' 'সাক্ষী' ও 'বিবর্তন' সম্পর্কে আবুল ফজল নিজেই লিখেছেন: 'মানবীয় ব্যাপারকে শাস্ত্রের কাঠামোয় ফেল্লে যে পরিণতি ঘটে তার নমুনা 'দ্বিতীয়বার' গল্পটি। আর, শাস্ত্রীয় নির্দেশ শাস্ত্রের কাঠামো ছাড়িয়ে মানবীয় হয়ে উঠলে যে মর্যাদা লাভ করে তার দৃষ্টান্ত 'সাক্ষী,' যদিও 'সাক্ষী' গল্পের উপকরণ খাস শাস্ত্রের এলেকা থেকে নেয়া। শাস্ত্রশাসিত গল্পের যে দুর্গতি তা 'দ্বিতীয়বারে' সুস্পষ্ট। শাস্ত্রের অনুশাসন মানতে গিয়ে ঐ গল্পে সাহিত্যের অনুশাসন হয়েছে উপেক্ষিত। ফলে ফিরোজার মতো চরিত্রও বাধ্য হলো চরিত্র হারাতে। অন্যদিকে 'সাক্ষীর' জোহরা পতিতা হয়েও মানবীয় গুণে ও চরিত্রে হয়ে উঠেছে অসাধারণ। সাধারণের মধ্যে অসাধারণের সন্ধানই তো সাহিত্যের বা শিল্পের এক বড় লক্ষণ। এ-প্রসঙ্গে 'বিবর্তন' গল্পের মওলানা চরিত্রও লক্ষ্যণীয়। নিছক মনুষ্যত্বের জোরেই সর্বতোভাবে শাস্ত্রবিদ হয়েও এ চরিত্রটি শাস্ত্র থেকে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। সাধারণত সামাজিক পরিভাষায় যাকে আমরা 'পতন' বলি, সে পতনের পথেও কি করে মনুষ্যত্বের এক অপ্রতিরোধ্য উদ্বোধন ঘটে তা এ-গল্পের মওলানা, জোহরা ও কবিরের চরিত্রে দৃষ্টিগোচর।"[১৭]

'সিতারা' প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংকল্প পত্রিকায়। খান বাহাদুর জনাব এম. মতিনের বয়স পঞ্চাশের কিছু উপরে। দিনের বরাদ্দ পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে চার ওয়াক্ত নামাজই তিনি বাড়ি সংলগ্ন মসজিদে সকলের সাথে আদায় করেন। কিন্তু মাগরিবের সময়ে গরহাজির থাকেন এবং সে সময়ে পটুয়াটুলি-ইসলামপুর-বাবুবাজার রাস্তায় পায়চারি শেষ করে হঠাৎ একটি গলিতে ঢুকে পড়েন। খান বাহাদুরের বিশেষ গলির বিশেষ বাড়িতে প্রবেশের কাহিনী বাবু বাজারের হোসেন খলিফা জানে। হোসেন খলিফা খান বাহাদুরের যাবতীয় কাপড়-চোপড় সেলাই করে থাকে। রাত এগারোটার দিকে প্রতিরাতে খান বাহাদুর ওই বিশেষ বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। খান বাহাদুরের নিঃসন্তান স্ত্রী দিলারা বেগম

প্রায় বছর পাঁচেক পূর্বে মারা গেছেন। দিলারা বিবি মারা যাবার বছর তিনেক পূর্বে খান বাহাদুর কলকাতা থেকে দশ বছরের একটি মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। মেয়েটির নাম সিতারা। খান সাহেবের মতে দিলারা বেগমের কোন সন্তান না হওয়াতে তিনি কলকাতায় একটি শাদী করেছিলেন এবং পারিবারিক ঝগড়া এড়ানোর জন্যে এতদিন সিতারা ও তার মাকে এখানে নিয়ে আসেন নি। সম্প্রতি সিতারার মা ওলাওঠা রোগে মারা যাওয়ায় সিতারাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন। আত্মীয়-স্বজনেরা বলাবলি করতে লাগলো যে, উত্তরাধিকারী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্যেই খান বাহাদুর সিতারাকে নিয়ে এসেছেন। খান বাহাদুর বাসায় শিক্ষক রেখে সিতারাকে লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। সিতারাকে বিয়ে দেবার সময়ে খান বাহাদুর চাকুরিজীবী পাত্রদের পছন্দ না করে তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করা সৈয়দাবাদের জমিদার-নন্দন সৈয়দ আরশাদ হোসেনকেই পাত্র নির্বাচন করলেন। বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি যেতেই সিতারা স্বামীর কুৎসিত ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে হতাশ হয়ে যায়। বাড়ির যুবতী চাকরানী মতিবিবির প্রতিই যেন স্বামী আরশাদের আগ্রহ বেশী। স্বামীর অপকর্মের কথা পিতার কাছে জানাবার পর বড়লোকের ছেলের ওই রকম এক-আধটু স্বভাব দোষ থাকা স্বাভাবিক বলে পিতা কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। ছয়মাস পর স্বামীকে বশে আনার চেষ্টায় সিতারা আরশাদকে বাপের বাড়ি নিয়ে এলো। একরাতে খানবাহাদুর সাহেব গেলেন সেই চেনা গলির বাসায় বাইজী মনুজান বিবির ঘরে। বাইজী মনুজান হলো সিতারার মা। মনুজান বিবিকে সিতারার বিয়ের সময়ে খানসাহেব কলকাতায় রেখে এসেছিলেন। সিতারার মায়ের পরিচয় নিয়ে মনুজান বিবি মেয়ে-জামাইর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনা তাই সে জামাইর জন্যে শখ করে কিছু জিনিস কিনে খান বাহাদুরের কাছে দিয়ে দিল। মাসখানেক পর এক রাতে মনুজান বিবির বাসা থেকে খান বাহাদুর বেরিয়ে যাবার পর তার প্রায় এগারোটার দিকে ঘরে গিয়ে ঢুকলো মেয়ের জামাই আরশাদ। মনুজান বাইজী আরশাদের গায়ে নিজের দেয়া জামাকাপড় দেখে জামাইর কাপড় চুরি হয়ে গিয়েছে বলে ভাবতে লাগলো। অন্যপক্ষে আরশাদ শুধু, বাইজী, গানা গাও, গানা গাও বলে চীৎকার করতে লাগলো। এক সময়ে আরশাদের নেশার ঘোর কেটে যায় এবং সে মনুজান বাইজীর সঙ্গে সিতারার চেহারার অপূর্ব মিল খুঁজে পায়। শেষ পর্যন্ত ছোরার

ভয় দেখিয়ে, সে শ্বাশুরীর কাছ থেকে সত্যিকার পরিচয় বের করে নেয়। গভীর রাতে আরশাদ ঘরে ফিরে খান বাহাদুরকে সব কিছু ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা ও সম্পত্তির জন্যে চাপ সৃষ্টি করে। মান-সম্মানের ভয়ে খান বাহাদুর আরশাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে। এ সময়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সিতারা সবকিছু শুনছিলো। শেষপর্যন্ত সিতারা সামনে এসে খান বাহাদুরকে প্রশ্ন করলো, তিনি তার পিতা কিনা। খান সাহেব অকপটে সিতারার পিতৃত্ব স্বীকার করলো। জন্মদাতার পরিচয় পেয়ে সিতারা নিজেকে অশ্বস্ত বোধ করে এবং বাইজীর মেয়েকে ঘৃণা হয় কিন্তু বাইজীর মেয়ের টাকার প্রতি কোন ঘৃণা না প্রদর্শন করার কারণে আরশাদকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। পরিশেষে সিতারা টাকার বাণ্ডিলগুলো আরশাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো। আরাশাদ টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল এবং পরদিন এ-টাকা খরচ করেই দৈনিক কাগজে খান বাহাদুরের কেলেঙ্কারি ফলাও করে প্রচার করে দিল।

'সিতারা' গল্পে অবুল ফজল ভণ্ড তপস্বীদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। সমাজে আমরা যাদেরকে অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় বলে মনে করি, তাদের যে আরও একটা ব্যক্তিগত জীবন থাকতে পারে এবং তা কতোটা জঘন্য ধরনের হতে পারে তার স্বরূপ যথার্থভাবে এ-গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে। 'বিবর্তন' গল্পের মওলানা এবং 'সিতারা' গল্পের খানবাহাদুর মূলতঃ একই স্টাইলের সৃষ্টি। এ-গল্পের সাথেও আমরা মাইকেল মধুসূদনের 'বুড় শালিকের রো' প্রহসনের একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারি। খানবাহাদুর সর্বসাধারণের কাছে নমস্য ব্যক্তিত্ব হলেও নিজের চারিত্রিক দৌর্বল্যের কারণে তিনি কাম-রিপুর কাছে পরাজিত হয়েছেন। খানবাহাদুর ব্যক্তি হিসেবে নিকৃষ্ট নন। তিনি পরোপকারী এবং দায়িত্বশীল। সমাজে তিনি নিজের মান-সম্মান বজায় রাখতে আগ্রহী এবং লোক-লজ্জা বা ইজ্জত সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। অন্যথায় তিনি টাকা-পয়সা দিয়ে আরশাদের মুখ বন্ধ করতে চাইতেন না। এ-গল্পের সবচেয়ে নিকৃষ্ট চরিত্র হলো সৈয়দ আশরাফ। ব্যক্তিত্বহীন পরান্নজীবী এবং লোভী লম্পট চরিত্র হিসেবে আরশাদ চরিত্রটি গল্পকার সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের নায়িকা সিতারা আপন মাধুর্যে উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সৃষ্টি। সিতারার মা বাইজী

হওয়াতে সিতারাকে গ্রহণ করতে আরশাদের আপত্তি, কিন্তু সিতারার পিতার সম্পদ নিতে আরশাদ কেন ঘৃণা করেনা, এ ধরনের সংলাপের ভেতর দিয়ে সিতারা চরিত্র খুব প্রখরভাবে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। আরশাদ একজন লম্পট হিসেবেই মনুজান বাইজীর ঘরে গিয়েছিল। শাশুরী কিংবা স্ত্রী ভেবে যায়নি। তাই, আরশাদের প্রতি সিতারার ঘৃণা প্রকাশের সাথে সাথে সচেতন পাঠকের মধ্যেও ঘৃণা সঞ্চারিত হয়। প্রাচীন সামন্ত জমিদার খান বাহাদুরদের যুগ এখন আর নেই, তবে নব্য ধনপতিদের মাঝেও আজকাল সিতারা গল্পের আবহ খুঁজে পাওয়া যায়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে খানবাহাদুর কিংবা আরশাদের মতো টিপিক্যাল চরিত্রসমূহ সৃষ্টিতে আবুল ফজল কালজয়ী হতে পেরেছেন।

'প্রেম ও মৃত্যু' গল্পটি 'মাহে নও' পত্রিকায় আশ্বিন, ১৯৬০ সংখ্যায় 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' নামে ছাপা হয়েছিলো। তবে, প্রকাশিত হবার পূর্বেই মুদ্রিত ফর্মা বাতিল করে দিয়ে অন্য লেখা দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে 'দিলরুবা' পত্রিকায় 'আজরাইল নাজেহাল' নামে গল্পটি ছাপা হয়েছিল।

গল্পের নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল বলেছেন "প্রেম ও মৃত্যু' গল্পটিরও প্রথমে নাম ছিল 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' পরে নাম দেওয়া হয় 'আজরাইল নাজেহাল'। এখন নাম দাঁড়িয়েছে 'প্রেম ও মৃত্যু'। আসলে পঞ্চশর ও আজরাইল প্রেম আর মৃত্যুরই ত প্রতীক।'[২০] গল্পের নায়ক আফতাবুল ইসলাম সি. এস. পি. পরীক্ষার ভাইভাভোসি এবং মেডিক্যালে টিকে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে বিশেষভাবে উচ্চারিত হয় আফতাবের নাম। একদিন হঠাৎ করে আফতাবের জ্বর উঠলো। একশো পাঁচ ডিগ্রীতে জ্বর উঠার পর একদিন দেখা গেল তার টাইফয়েড হয়েছে। লেখকের ভাষায় বলতে গেলে আফতাবের জীবন নিয়ে মৃত্যুদূত আজরাইল এবং প্রেমের দেবতা পঞ্চশরের মধ্যে লড়াই হচ্ছিল, এখন যুদ্ধ চলছে আজরাইল এবং ডাক্তারের মধ্যে। হাসপাতালের কুৎসিৎ নার্স আমিনার ওপর পড়লো আফতাবকে দেখা-শোনার ভার। আমিনা একটি গোলাপ ফুল এনে আফতাবকে উপহার দিল। ধীরে ধীরে আফতাবের সাথে আমিনার ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরই মধ্যে আফতাবকে উপলক্ষ্য করে হাসপাতালে আজরাইল ও

পঞ্চাশরের মধ্যে বাক্ বিতণ্ডা শুরু হয়। আজরাইল চায় মানুষের রুহ কব্জা করে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দিতে, আর পঞ্চশর চায় দুনিয়াতে মানুষকে রেখে দিয়ে মানুষের ভোগলালসা পরিতৃপ্ত করতে। আমিনার সেবা-শুশ্রূষার ফলে আফতাব সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তারা বিয়ে করার পরিকল্পনা করে। একদিন হাসপাতাল থেকে দুজনে পাশাপাশি বসে মোটরে করে ঘুরতে বেরিয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে আজরাইল ও পঞ্চশর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'প্রেম ও মৃত্যু' গল্পের আমিনা এবং 'বিবর্তন' গল্পের ফুলির মধ্যে একটি সরল রেখা টানা যায়। উভয় গল্পেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের সাথে অবহেলিতা নারীর প্রেম দেখানো হয়েছে। মওলানা সাহেব এবং আফতাব উভয়েই নিজ নিজ সামাজিক অবস্থান থেকে কয়েক ধাপ নীচে নেমে এসে নারীর জীবনে আশ্রয়দাতা হিসেবে নিজেদের দাঁড় করিয়েছে। ফুলি ও আমিনা চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে আবুল ফজল মানবতা-বাদী সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। "গল্পের মধ্যে আছে দু'টি ধারা পাশাপাশি একই উদ্দেশ্যাভিমুখী। এক ধারায় দেখানো হয়েছে আজরাইল-মদনের বিতর্ক, অন্য ধারায় আমিনা-আফতাবের প্রেম। বলাই বাহুল্য, একটি অপরটির পরিপূরক এবং উভয়ে পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। গল্প বর্ণনার এই ভঙ্গিটি অভিনব। কথা-সাহিত্যিক এবং প্রবন্ধকার—দুই আবুল ফজলের পরিচয় দুটি ধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কথাসাহিত্যিক আবুল ফজলকে মেলে আমিনা-আফতাবের প্রেম-কাহিনীর মধ্যে, পক্ষান্তরে আজরাইল-মদন সংবাদে মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রবন্ধকার আবুল ফজলের পরিচয়। এইভাবে গল্প-লেখক ও প্রবন্ধকারের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গল্পটি এক অভিনব শিল্পমর্যাদা লাভ করেছে। আজরাইল-মদনকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধকারের দেশ-কাল ও জীবন সম্পর্কিত গভীর মূল্যবান ধ্যান-ধারণার অভিব্যক্তি ঘটেছে যা প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক সৎ নাগরিকেরই সবিশেষ চিন্তার খোরাক হবে। পক্ষান্তরে, আমিনা-আফতাবের প্রেমকে কেন্দ্র করে অভিব্যক্ত হয়েছে শিল্পীর মানবপ্রেম ও সৌন্দর্য-সাধনা। মানবজীবন মৃত্যুর কাছে পরাজিত নয়, মৃত্যুর মুখেও জীবনের জয়পতাকা তুলে ধরে মানুষের প্রেম একথা ঘোষণা করতে কখনো কুণ্ঠিত নয় যে আমি অমর, আমি অমৃতের সমান।"।[২১]

"গল্প সংকলন" আবুল ফজলের চতুর্থ গল্পগ্রন্থ। এ গ্রন্থের ষোলটি গল্পের মধ্যে পনেরটি নেয়া হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ-গল্প' থেকে। 'শ্রেষ্ঠগল্পের' অন্তর্ভুক্ত ৩০টি গল্পের দশটি 'আবুল ফজল রচনাবলী' (১ম খণ্ড)-তে মুদ্রিত হয়েছে। 'আক্কল গুড়ুম' একটি কিশোর গল্প। এটি প্রকাশিত হয়েছিল জানুয়ারী, ১৯৬৭ সালের ঈদ সংখ্যা 'টাপুর টুপুর' পত্রিকায়। গল্পটি কিশোরদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে। সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা সবকিছুকেই একটি স্থানিক বা কালিক রূপ দিয়ে থাকি। এ-গল্পের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সম্পর্কে কেউ সত্যিকারভাবে কিছু জানতে না চেয়ে শোনা কথায় অনেক অবাস্তব কল্পনার ইমারত গড়ে তুলেছে। তাই শেষ পর্যন্ত লেখক এ-কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, জানার ফলেই আমাদের দুঃখ বাড়ে, চিন্তা বাড়ে। পক্ষান্তরে, না জানার ফলে সুখের সাথে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাওয়া যায়।

উপরে আলোচিত গল্পসমূহ ছাড়াও আবুল ফজলের আরো অনেক গল্প রয়েছে যেগুলোতে বিশেষ কোন ভাব বা রচনাশৈলীর বিকাশ ঘটেনি বলে এ-আলোচনায় অনুর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে, আবুল ফজলের প্রতিটি গল্পই মানুষ ও সমাজকে নির্ভর করে রচিত হয়েছে। "আবুল ফজল বলিষ্ঠ সমাজসচেতন জীবনশিল্পী। জীবনপ্রেমী ও জীবনপিয়াসী মানুষের আলেখ্য তিনি শক্তিশালী ভাষায় রচনা করেছেন।"[২২] তৎকালীন বাঙালী মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্যে যে ক'জন সাহিত্যিক কলম ধরেছিলেন, আবুল ফজল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম জীবনে কথাসাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের জীবনচিত্রণের মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করে তোলার অভিপ্রায়ে আবুল ফজল অনেকগুলো গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। "আবুল ফজল তাঁর লেখক জীবনের সূচনা থেকেই যথেষ্ট সমাজ-সচেতন। বাঙালী মুসলমান সমাজের প্রগতিবিমুখতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে গিয়ে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর অধিকাংশ লেখক প্রবন্ধকেই প্রধান মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ-সময়ে গল্প-উপন্যাসকেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করেন।"[২৩] আবুল ফজল সুদীর্ঘকাল সাহিত্য-চর্চা করেছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। কোন সাহিত্যিকেরই সকল সৃষ্টি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়না। তাই, আবুল ফজলের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সঙ্গত কারণে মন্তব্য করা যায় যে,

তাঁর সকল ছোটগল্প সৃষ্টিকুশলতায় সার্থক হয়ে ওঠেনি। তবে তৎকালীন অবহেলিত সমাজ-জীবন চিত্রণে তিনি বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবীদার। "ছোটগল্প লেখা শঙ্খে সমুদ্র পোরার মতই দুরূহ। সে কৌশল আবুল ফজলের জানা আছে—তাঁর 'মাটির পৃথিবী'ই তার প্রমাণ। এর গল্পগুলি একাধারে কাহিনী ও কবিতা। আভিজাত্যাভিমানী অথচ দরিদ্র মুসলমান সমাজের যে নিখুঁত চিত্র ইনি এঁকেছেন, তার তুলনা নেই। কথা-সাহিত্যে তাঁর এই দান বহু সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করবে, এক অনাবিষ্কৃত দিকের সন্ধান দেবে। বাংলার যে অর্ধঅংশ অজানা ছিল, সেই অবহেলিত সমাজের দিকে চোখ ফিরিয়ে আবুল ফজল দেশের ও সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করলেন।"[২৪] এ-প্রবন্ধে আলোচিত চারটি গল্পগ্রন্থেই আমরা দেখতে পাই বেশির ভাগ গল্পেই আবুল ফজল বাঙালী মুসলমানের চরিত্র রূপায়ণের প্রয়াস পেয়েছেন। যে সময়ে মুসলমান নর-নারীর জীবন সাহিত্যের পাতায় স্থান পেতে শুরু করেনি কিংবা কেউ তা করতে সাহসও করেননি সে সময়েই আবুল ফজল এ ক্ষেত্রে সাহসী গল্পকার হিসেবে এগিয়ে এসেছেন। "আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ পরিচয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে আর তাঁর বিশেষ অবদান বাঙালী মুসলমানের জীবন-চিত্রণে।"[২৫] সমাজে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা এবং প্রভাবপ্রতিপত্তির সংগ্রামে লিপ্ত মৌলবীদের চরিত্রচিত্রণে আবুল ফজল যে সাহসিকতা, সহানুভূতি ও মানবতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতীব প্রশংসার দাবী রাখে। এ সকল চরিত্রচিত্রণের ভেতর দিয়েই আবুল ফজল তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। "কিছুদিন আগে কোনও গল্প সংকলনে আবুল ফজলের একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প পড়েছিলাম। বলতে কি, ঐটেই ছিল সেই সংকলনের প্রধান (সেরা) গল্প। এতে গাল্পিকের সহানুভূতি, বাস্তবতাবোধ, স্বচ্ছ চিন্তা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে নিপুণভাবে কোনো মৌলভী সাহেবের 'জীবন পথের যাত্রা' আঁকা হয়েছে। অন্যলোকের হাতে পড়লে হয়ত কালিমালিপ্ত একটি পাষণ্ডের চিত্র হয়ে পড়িত, কিন্তু শিল্পীর হাতে তা হয়ে উঠেছে একটি যাত্রিকের সংগ্রাম-ময় (আর শোভাময়) বলিষ্ঠ চরিত্র।"[২৬] আবুল ফজলের ছোট-গল্প সম্পর্কে বিপরীত সমালোচনাও আছে। তার গল্প প্রায়ই বর্ণনাধর্মী। কয়েকটি বিখ্যাত গল্প ছাড়া প্রায় সর্বত্রই তিনি কতিকথনদোষ-মুক্ত নন। চরিত্র বিশ্লেষণের চাইতেও সরল ঘটনার স্রোতে গল্প কাহিনী-নির্ভর হয়ে পড়েছে। গল্পের পরিকল্পনা ততোটা সংবদ্ধ নয়, যতোটা হওয়া

প্রয়োজন ছিল। কোথাও কোথাও গতানুগতিক। তবে আবুল ফজলের ছোটগল্পে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর মানবিকতা। মানুষ হিসেবে আবুল ফজল কতোটা মহান ছিলেন তার ছাপ তিনি তাঁর সৃষ্টি-কর্মে রেখে গেছেন। সমাজের ভণ্ডামী, নীচতা, হীনতা, ধর্মব্যবসায়ীদের মিথ্যা ছদ্মবেশ, যৌনতা, অসহায় নারীর জীবন ইত্যাদি চিত্রণে সর্বত্রই তাঁর উদার মনের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টায় কোন ফাঁকি ছিল না। যেটুকু ত্রুটি তাঁর লেখায় প্রকাশিত তা তাঁর যুগেরই সীমাবদ্ধতা। আবুল ফজলকে বিচার করার সময়ে তাই তাঁর যুগকে স্মরণ রেখেই করতে হবে, অন্যথায় আজকের মাপকাঠিতে তাঁর অনেক গল্পই যথাযথ মর্যাদা পেতে সক্ষম হবে না। কারণ, আবুল ফজল নিজে সমাজ ও সাহিত্য কিংবা চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর কথা দিয়েই আলোচনা শেষ করতে চাই: “ঘটনা ছিল একদিন কথা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য—আজ হয়েছে চরিত্র। সমাজই যুগিয়ে থাকে সবরকম চরিত্রের আভাস ও ইঙ্গিত। তাই বলছিলাম,—সমাজ ও সাহিত্য হচ্ছে পরস্পরের পরিপূরক। সব বড় সাহিত্যেরই উপকরণ সমাজ থেকেই সংগৃহীত। শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির উপকরণ যুগিয়েছে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ও সমসাময়িক যুগের নরনারীর চরিত্র। রোমা রোঁলা নাকি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত জাঁ ক্রিস্তফ চরিত্রের প্রেরণা পেয়েছেন বিটোফেনের জীবনে। এই যুগে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রামমোহন ও বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের জীবন পশ্চিম বঙ্গের বহু সাহিত্যিকের রচনার উপকরণ ও প্রেরণার কারণ হয়েছে।”[২৭]

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল হাসনাত (সম্পাদিত): আবুল ফজল, রফিক কায়সার, ‘হোমাগ্নির শেষ শিখা’, পৃষ্ঠা ২০৩
২. মনসুর মুসা : পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, ১৯৭৪, ঢাকা, পৃ. ২৩
৩. আবুল ফজল, স্বনির্বাচিত গল্প সংকলন, ‘লেখকের কথা’।
৪. খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ১৯৭৪, ঢাকা, পৃ. ৪৬৫
৫. আবুল ফজল, স্বনির্বাচিত গল্প সংকলন, ‘লেখকের কথা’।
৬. আনোয়ার পাশা: সাহিত্য-শিল্পী আবুল ফজল, ১৯৬৭ চট্টগ্রাম, পৃ. ১০০-১০১

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
৮. আবুল ফজল: স্বনির্বাচিত গল্প সংকলন, 'লেখকের কথা'।
৯. পূর্বোক্ত
১০. আনোয়ার পাশা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-১০২
১২. দেশ: ৬ বৈশাখ, ১৩৪৮ বাংলা।
১৩. Lila Roy : A challanging Decade--Bengali Literature in the forties, P. 29.
১৪. আনোয়ার পাশা, পূর্বোক্ত পৃ. ১০৭
১৫ পূর্বোক্ত পৃ. ১০৭।
১৬. পূর্বোক্ত পৃ. ১০৯
১৭. পূর্বোক্ত পৃ. ৯৩
১৮. পূর্বোক্ত পৃ. ১৭০
১৯. স্বনির্বাচিত গল্প সংকলন, পূর্বোক্ত
২০. পূর্বোক্ত
২১. আনোয়ার পাশা, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬৪-১৬৫
২২. বাংলাদেশের ছোটগল্প (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯, ঢাকা, ভূমিকা (আট)।
২৩. খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৬০-৬১
২৪. কাজী নজরুল ইসলাম: 'সওগাত', ২২শ বর্ষ-১২শ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৭ পৃ. ১০
২৫. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৭৯
২৬. কাজী মোতাহার হোসেন: আবুল ফজল, সম্পাদনায়-আবুল হাসনাত, পূর্বোক্ত পৃ. ২৪
২৭. ১৯৫৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের 'কথাসাহিত্য' শাখার সভাপতির অভিভাষণ।